www.banglainternet.com represents

Dr. Zakir Naik’s Bangla Ebook

SUNNAT O BIGGAN

(SUNNAH AND SCIENCE)

Contents

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবী মানুষের স্থায়ী আবাস নয়। সাময়িক নিবাস মাত্র। তাই স্রষ্টা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হননি। তাদের জন্য নাযিল করেছেন নিদর্শনাবলি বা কিতাব। এই কিতাব মানুষকে পরিচালিত করে সঠিক গন্তব্যে। তাকে জানিয়ে দেয় কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে। অবহিত করে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষার কৌশল ও উপায়।

এরপরও মানুষ যেন বিপথগামী না হয় সেজন্য তিনি যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন রাসূল তথা পথ প্রদর্শক। সকল নবী-রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও চূড়ান্ত নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি এসেছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হিসেবে। তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য আদর্শ। তার কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে আমরা বলি সুন্নাত। তাহলে রাসূল (স) এর জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া প্রতিটি কাজই হচ্ছে সুন্নাতের অংশ। অর্থাৎ তিনি কীভাবে কথা বলতেন, আহার করতেন, পোশাক পরিধান করতেন, পবিত্রতা অর্জন করতেন, ইবাদত-বন্দেগী করতেন, ঘুমাতেন প্রভৃতি সকল কর্মকাণ্ডই সুন্নাতের অর্ন্তভুক্ত।

অপরদিকে বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান ও পরীক্ষিত সত্য। আর মানব কৌতূহল থেকেই শুরু হয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা। তাই কালের দাবী পূরণে রাসূলে আকরাম (সা) এর জীবন নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। এসব গবেষণা ও পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (স) এর জীবনের প্রতিটি কাজের কল্যাণময়তা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে রাসূল (স) এর জীবনে খুঁজে পেয়েছেন শিফা। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রাত্যহিক জীবনে তাকে অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা আজ নিশ্চিত হয়েছেন যে, কেউ যদি হযরত মুহাম্মাদ (স) এর মতো জীবন পরিচালিত করে তবে তিনি কখনোই ক্যান্সার ফিস্টুলা, ইনফেকশন, ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত হবেন না। তাই বলতেই হবে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের অনুশীলন ও প্রতিপালন আজ বিজ্ঞানের দাবীতে পরিণত হয়েছে।

পবিত্রতা অর্জন ও বিজ্ঞান

আল্লাহ্ তাআলার সত্তা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। তিনি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে পরিচ্ছন্নতার ওপর আল্লাহর জ্যোতি বিদ্যমান। তাই তিনি পবিত্র। তিনি সকল ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র। কোনো ধরনের ফেরেববাজি, রিয়াকারী এবং হিংসা-বিদ্বেষ যেমন তাঁর সত্তার সাথে সঙ্গত নয় তেমনি কৃপণতা ও সংকীর্ণতার মতো খারাপ দোষগুলো থেকেও তিনি সত্তাগতভাবে পবিত্র। তাঁর গুণাবলি পবিত্র ও প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী- মাজীদ। সুতরাং আদেশ হলো, হে মুসলমানগণ মাখলুক বা সৃষ্ট জীব হওয়ার কারণে তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তোমরাও আল্লাহর চরিত্র এবং গুণাবলি নিজেদের মধ্যে ধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।

এটা স্পষ্ট যে, একজন প্রকৃত আমলকারী মুসলমানের জীবন সকল দিক হতে পাক-পবিত্র, সকল প্রকারের অনিষ্টকারী জীবাণু থেকে সংরক্ষিত। তিনি সকল রকমের প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পাক-সাফ হয়ে থাকেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি হিংসা লালসা মনে রাখবেন না। চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচার করবেন না। গালমন্দ করবেন না। সবসময় সত্য বলবেন এবং মিথ্যা হতে বেঁচে থাকবেন। প্রদর্শনী থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। ফেরেববাজি, ধোঁকাবাজি কখনও করবেন না। নিজস্ব কাজ ও কথায় সকল মুসলমান নিজেরা যা করে তার উদাহরণ নিজেই হবেন। অপরকে কখনো কষ্ট দেবেন না এবং ক্ষতি করবেন না। বরং সবসময় অন্যদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য তৈরী থাকবেন এবং অন্যদের অধিকার বিনষ্ট করবেন না। দুর্বলদের সহায়তা করবেন, প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ করবেন।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ ঃ প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলমান তিনি যার মুখ এবং হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।

আরেকটি হাদীস– নবী করীম (স) ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস না চাইবে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।'

(সহীহ বুখারী)

মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ হলো হালাল খাবে, হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, নিজের চিন্তাধারাকে পাক-পবিত্র রাখবে। দেহকে পবিত্র রাখবে, পোশাক-পরিচ্ছন্ন রাখবে, কথা ও কাজ পবিত্র করবে, মিথ্যা বলবে না এবং কার্যাবলি পবিত্র রাখবে। যেন এ অনুভূতি হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র।

ইসলামে নামাযের বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। নামায আদায়ের জন্য পূর্ব শর্ত হলো, ব্যক্তির দেহ পাক-পবিত্র হবে। তার পোশাক পবিত্র হতে হবে, তিনি ওযু সম্পন্ন করবেন। নামাযের আগে সব রকমের শারীরিক পবিত্রতা প্রয়োজন। নবী করীম (স) ঘোষণা করেন- اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থ ঃ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (সহীহ মুসলিম)

অন্যত্র ঘোষণা করেন ঃ اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ। 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।'(সুনানে তিরমিযী)

এতে স্পষ্ট হলো যে, একজন মুসলমানের জন্য তার ঈমানের অংশ হলো সবসময় পবিত্র থাকা। ইসলাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতার দীক্ষা এতটাই দিয়েছে, অমুসলমানদের পথিকৃৎগণও একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইসলাম যে পরিমাণ পবিত্রতার ওপর জোর দিয়েছে অপর কোনো ধর্ম তা দিতে পারেনি। তাই ডা. রবার্ট স্মিথ, বিশ্ব বিখ্যাত সার্জন মাসলামা প্রমুখ লিখেছেন, 'আমরা পবিত্রতার আমল ইসলাম হতে শিখেছি।' সবচেয়ে বড় গান্ধা ঐ জিনিস যা মানুষের দেহ থেকে পায়খানা-প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়। ইসলাম এগুলো নির্গত হওয়ার পর উত্তমরূপে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা) অর্জন করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

ইসলামে নির্দেশ আছে যে, যদি মানুষের প্রকৃতির ডাক যেমন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে এ প্রয়োজন শেষ করে পবিত্রতা অর্জন তথা ইস্তিঞ্জা করতে হবে। প্রথমে উত্তমরূপে মাটির ঢেলা দ্বারা পরিষ্কার এবং তারপর দুবার পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করতে হবে। অথবা পুণরায় পানি দ্বারা যথেষ্টভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করতে হবে। পায়াখানা-প্রস্রাব করার সময় কিবলার দিকে পিঠ অথবা মুখ করা যাবে না, চাই সেটা খোলা জায়গা বা ঘর হোক। যদি মনের ভুলে এমন হয় তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নিতে হবে। প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় খালি মাথায় যাওয়া যাবে না এবং বাতাসমুখী হয়েও বসা যাবে না।

পায়খানা-প্রস্রাব খানায় যাওয়ার সময় মুস্তাহাব হলো বাথরুমে প্রবেশের আগে নিচের দুআ পড়া–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি খবীস (দুষ্ট) পুরুষ জ্বিন এবং নারী জ্বিন থেকে তোমার আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী)

টয়লেটে পায়খানা করতে সর্বপ্রথমে বাম পা ভেতরে রাখবে, যখন বসার নিকটবর্তী হবে তখন শরীর হতে কাপড় গুছিয়ে নেবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নগ্ন হবে না। পা ছড়িয়ে বা-পায়ের ওপর জোর দেবে এবং চুপ থেকে প্রয়োজন সারবে। যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাতের আঙুল দ্বারা গুপ্তাঙ্গের গোড়া থেকে আগার দিকে চাপ দেবে যাতে পেশাবের যে ফোঁটা ভেতরে রয়েছে তা শরীর হতে বের হয়ে যায়। অতঃপর পানি, মাটির ঢেলা অথবা একের পর অন্যটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। এর আগে তিনটি ঢেলা দিয়ে অতঃপর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা ধৌত করবে। পানির পাত্র এমন উঁচুতে রাখবে না যাতে ছিটা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে প্রস্রাবের স্থান ধৌত করবে পরে মলদ্বার। মলদ্বার ধোয়ার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের জোর কমিয়ে ঢিলে রাখবে এরপর উত্তমরূপে ধোবে, যাতে ধোয়ার পর হাতে কোন গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে। অতপর কোনো পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে নেবে। যদি কাপড় না থাকে তাহলে বারবার হাত দিয়ে মুছবে। একথা মনে রাখবে যে, খাড়া হওয়ার আগে শরীর ঢেকে নেবে এবং বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে এবং এ দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ .

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার কাছ হতে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দিয়েছেন এবং উপকারী দ্রব্য সন্নিকটবর্তী করেছেন।

প্রস্রাব-পায়খানা হতে বের হওয়ার পর আরো একটি দুআ রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন রাসূল (স) হাজত অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন তখন সে স্থান ত্যাগ করে পড়তেন غُفْرَانَكَ -'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী।' (যাদুল মাআদ)

ইস্তিঞ্জা পানি অথবা মাটির ঢেলা দিয়ে অথবা উভয় কর্তৃক করা উচিত। হাড্ডি অথবা গোবর জাতীয় জিনিষ ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ঠিক নয়। কেননা এগুলোর ভেতর ক্ষতিকর জিনিস থাকে।

সুন্নাতের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

বিশ্বনবী (স) প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মানবকল্যাণ ও সহজতর পথ-নির্দেশনা দিতেন। যদি নবী করীম (স)-এর জীবন জিন্দেগী আলোচনা করা যায়, তবে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহজতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার উপলব্ধি করা যাবে।

তামাম দুনিয়া আজ আবার তাঁর জীবনযাপন ও কর্মপদ্ধতির দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে তরীকায় নবী করীম (স) আমাদের জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূল (স)-এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা উপস্থাপন করা হলো–

❑ রাসূল (স) পায়খানা প্রস্রাবের জন্য বহু দূর হেঁটে যেতেন। পায়খানা প্রস্রাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে কয়েকটি বাস্তব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি চলাফেরার ওপর জোর দিচ্ছে এমনকি মার্কিন মুল্লুকের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লেখা রয়েছে 'পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন?' একথা স্পষ্ট যে, পা প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে চলার দিকে আহ্বান জানানো। বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণরসায়ন) জনৈক বিজ্ঞ অধ্যাপক বলেন, "যখন হতে শহরের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কারণ যখন হতে দূরে পায়খানা প্রস্রাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে, সে সময় থেকে অদ্যাবধি গ্যাস, পেট ও পাকস্থলীর পীড়াগুলো বেড়ে চলেছে।"

মানুষের চলার ফলে অন্ত্রগুলোর নড়া-চড়া বেড়ে যায়, যার দ্বারা পায়খানা প্রস্রাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার ভিতরেই প্রস্রাব করি এবং বাইরে চলে যাই না। এ জন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় থাকতে হয়।

❑ রাসূল (সা.) পায়খানা-পেশাবের জন্য কাঁচা এবং নরম মাটি বাছাই করতেন। এর মধ্যেও অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। একটি ব্যাখ্যায় দেখা যাক-

লিউভাল পল (Louval Poul) তাঁর রচিত বই 'স্বাস্থ্যবিধি'-তে লিখেছেন : "মানবতার স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন থেকে আমরা মাটির ওপর পায়খানা পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জায়গা (ফ্লাশ, কমোড এবং ডব্লিউ-সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে শুরু করেছি সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে পৌরুষ দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাব প্রস্টেট গ্লান্ডস (Prostate Glands) -এর ওপর পড়ে।"

সাধারণত যখন মানুষের দেহ থেকে বর্জ্য বের হয় তখন মাটি এগুলোর জীবাণু এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো চুষে নেয়। যেহেতু ফ্লাশ ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি নেই, এজন্য ঐ সব ক্ষতিকর জীবাণুর প্রভাব যা মাটি চুষে নিত, ফ্লাশে পেশাব করার কারণে এ সব জীবাণুর প্রভাব দুবার আমাদের দেহের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং আমরা ধীরে ধীরে রোগের দিকে ধাবিত হই।

আরো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার লিখেন : "নরম ও কর্ষিত মাটি সকল জিনিসকে শোষণ করে নেয়। যেহেতু পেশাব এবং পায়খানা জীবাণুযুক্ত বর্জ্য, এরজন্য এমন মাটি দরকার যা এগুলোকে শোষণ করতে এবং একে ছিটার প্রতিবন্ধক হয়ে শরীর এবং দেহের ওপর পড়া থেকে ফেরায়। যা ফ্লাশ দ্বারা সমাধান হতে পারে না, সেখানেও ছিটার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বর্জ্যকে শোষণ করার কোনো গুণ নেই। ফ্লাশে প্রস্রাব করার কারণে বর্জ্যের বাষ্প শোষণ হতে পারে না, যে কারণে বর্জ্য থেকে ভেসে আসা বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।"

পশ্চিমা সভ্যতা কমোড-এর প্রচলন করেছে যাতে মানুষ চেয়ারের মত বসে পায়খানা-প্রস্রাব করে। কমোডের ব্যবহারে লোকেরা উত্তমরূপে বর্জ্য মুক্ত হতে পারে না। কারণ এটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। এ ধরনের কমোডের কারণে পায়খানা ঠিক মত বেরও হয় না। এছাড়াও কমোড ব্যবহারের পর অন্য স্থানে বসে লজ্জাস্থান ধোয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

ডব্লিউ সি এক প্রকারের চেয়ার যাকে ইউরোপের লোকেরা প্রস্রাব-পায়খানার জন্য ব্যবহার করে। ডব্লিউ সি-এর ওপর চেয়ারের মতো বসে পায়খানা-প্রস্রাব করা যায়। এ পদ্ধতি মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ধরনের চেয়ার সদৃশ জিনিসের ওপর পায়খানা প্রস্রাব করায় বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কিছু শারীরিক ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো –

- ডব্লিউ সি-এর ওপর বসে পায়খানা প্রস্রাব করায় শরীরে টানা হেঁচড়া হয় যার দ্বারা মানবদেহের ক্ষতি হওয়ার নানাবিধ আশঙ্কা থাকে।
- ডব্লিউ সি-এর সহায়তায় পায়খানা করার কারণে প্রয়োজন পূরণ পরিপূর্ণভাবে হয় না, যার পরিণামে বিভিন্ন রোগের জন্ম হয়। যেমন– ধ্বজভঙ্গ, বমন, পাকস্থলীর জ্বালা, লজ্জাস্থানের ক্ষত, লজ্জাস্থানের জ্বালা-পোড়া, গ্যাস ইত্যাদি।
- ডব্লিউ সি-তে পায়খানা প্রস্রাব করার জন্য চেয়ারের মতো বসতে হয়, যার কারণে পায়খানার সঠিক এবং প্রাকৃতিক বহির্গমন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না এবং বর্জ্য সামান্য হলেও বৃহদন্ত্রে আটকে রয়ে যায়, যা নানাবিধ রোগ-ব্যাধির সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- ডব্লিউ সি-এর উপর পায়খানা প্রস্রাবের দ্বারা পরবর্তীতে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। আর এ ফোঁটা পড়ার জন্যে ক্ষত-বিক্ষতসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।
- ডব্লিউ সি-তে পায়খানা প্রস্রাব করলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না, যে কারণে পেট এবং পাকস্থলীতে নানান রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন : পাকস্থলীর জ্বালা, বদ হজম এবং গ্যাস্ট্রিক-আলসার ইত্যাদি।
- এটা নতুন খবর যে ডব্লিউ.সি স্থাপন শরীরের প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিপরীত। যখন সুন্নাত মোতাবেক পায়খানা প্রস্রাব করা হয়, তখন পুরো শরীর ঢিলে হয় এবং পায়ুকে পায়খানা বের করার উপযোগী করে দেয়। কিন্তু ডব্লিউ.সি ব্যবহারে সমস্ত শরীর ঢিলে হয় না এবং পায়খানার স্থানও সংকীর্ণ থাকে। যার ফলে মানসিক, লিভার, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগ-বালাই হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ (স) এর দেখানো পদ্ধতি অতি উপকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের নবী করীম (স) এর পন্থায় পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা ও আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। এছাড়া কোনো ধর্মেই এরূপ কোনো উদাহরণ মিলবে না। রাসূল (স) কী পরিমাণ সৌন্দর্যের সাথে মানুষের অপবিত্রতা ও পবিত্রতার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন যে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, "বাস্তবেই নবী করীম (স) এর পবিত্রতার বিধানের কোনো তুলনা নেই এবং মহানবী (স) এর বর্ণিত এবং প্রদর্শিত পদ্ধতি অতি উপকারী।"

বর্তমানে বহুল প্রচলিত প্রথমোক্ত 'ফ্লাশ' পদ্ধতি প্রাকৃতিক নিয়ম-পদ্ধতির কাছাকাছি। এজন্য এর ক্ষতি কমোড এবং ডব্লিউ.সি-এর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু

কাঁচা পায়খানা এবং নরম মাটিতে পায়খানা-পেশাব করার যে ধরনের উপকারিতা তা সেখানে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে যেহেতু মাটি এবং খোলা জায়গা সকল স্থানে পাওয়া খুবই কঠিন এ কারণে বর্তমানে ফ্লাশ সিস্টেম উত্তম।

গ. রাসূল (স) পা ছড়িয়ে এবং বাম পায়ের ওপর জোর দিয়ে নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়খানা প্রসাব সারতেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানগত উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো–

শারীরবিদ্যার একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, 'আমি মারাকাশ ছিলাম। একজন ইহুদি চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। উনি যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। যখন আমি আমার নাম লিখালাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি কি মুসলমান?'

আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। মুসলমান এবং পাকিস্তানিও।' উনি বলতে লাগলেন, আপনাদের পাকিস্তানে যদি স্বয়ং আপনাদের নবীর একটি নীতি জীবিত হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানিরা কয়েকটি রোগ থেকে বাঁচতে পারে। আমি কৌতূহলবশত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : সেটা কোন পন্থা?' ইহুদি ডাক্তার বললেন, "তা পায়খানা প্রসাবের পন্থা। যদি পায়খানা প্রস্রাবের জন্য ইসলামি পদ্ধতিতে বসা হয় তাহলে এপেন্ডিসাইটিস, পাইলস এবং গেজ রোগ জন্ম নেবে না। যদি মুসলমান স্বয়ং নবী করীম (স) এর পদ্ধতিতে পায়খানা প্রস্রাব সম্পন্ন করে তাহলে এসব রোগ হতে বাঁচতে পারে।'

পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেন, 'আমি আমার নবী করীম (স) এর পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। আমার আফসোস হলো যে, আমি ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করিনি যে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মাসআলাগুলো শিখে নেব। তখন আমার এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগল। আমি এ ইহুদি চিকিৎসকের নিকট জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মারাকাশে একজন দ্বীনী আলেম ছিলেন। আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম এবং রাসূল (স) এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলাম। যখন তিনি এ পদ্ধতি বর্ণনা করে সহজে বুঝিয়ে দিলেন, তখনই আমি আমল শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার কিছু সময় লাগল, কিন্তু এর উপকারিতা খুব শীঘ্রই আমার বুঝে আসল এবং এ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি পায়খানা প্রস্রাবের জন্য ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যে পদ্ধতি নবী করীম (স) শিক্ষা দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান নবী করীম (স) এর এই পায়খানা প্রস্রাবের পদ্ধতির ওপর ধারাবাহিক গবেষণা করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন।

স্বাস্থ্য ও জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের নবী করীম (স) এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের নবী করীম (স)এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করায় গ্যাস, বদহজম, পাইলস, গেজ ইত্যাদি রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায়, এবং বিশেষ করে নবী করীম (স) এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এ সব ব্যাধিকে ধ্বংসও করে দেয়।

ঘ. নবী করীম ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিল ও তা বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূল (সা.)-এর এ সুন্নাতের মধ্যেও বহু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো–

এ সময়ের বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নতমানের রোগ নিরাময়ের অংশ মজুদ রয়েছে। যেহেতু পায়খানা-প্রস্রাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং এতে জীবাণু ভর্তি হয়ে থাকায় মানুষের চর্মে লাগা খুবই ক্ষতিকর। যদি এর কোনো অংশ চামড়ার ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অগণিত ব্যাধি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন : ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন দুনিয়াকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল; কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির বিভিন্ন স্তর জীবাণু ধ্বংসকারী। যখন ঢিলের ব্যবহার হয় তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে এর ওপর লেগে থাকা তামাম জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের যেমন জরায়ু বা প্রোস্টেট ক্যান্সার হতেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন মাটির ঢেলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটির ঢেলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন তারা তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেছেন।

সর্বোপরি আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, এ সব মাটির মানুষ পুনরায় মাটি থেকে আরোগ্য লাভ করে। চাইলে পৃথিবীর সব ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইসলামের নবী করীম (সা.) এর পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে রোগ হতে মিলবে সুরক্ষা।

ইস্তিঞ্জা ও পবিত্রতার জন্য আজকাল টিস্যু পেপার অথবা টয়লেট পেপার ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা আগ্রহের সাথে এগুলোর ব্যবহার করে। সব লোকের ধারণা যে

Contents

টয়লেট পেপারের চেয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার আর কিছুতে হয় না। অথচ টয়লেট পেপার দ্বারা কিছু না কিছু ময়লা শরীরের ওপর অবশিষ্ট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যদি গোসলের প্রয়োজন হয় তাহলে লোকেরা এভাবে টয়লেট পেপার দ্বারা অবশিষ্ট ময়লার সঙ্গে পানিতে বসে যায়, যার দ্বারা শুধু ঐ রোগই বাড়ে না বরং পাত্রের সকল পানি ময়লা ও গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যা গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যদি এতদসত্ত্বেও মানুষ এর দ্বারা গোসল করে তাহলে তার সর্বশরীর নাপাক ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এ হচ্ছে সেই পশ্চিমা সংস্কৃতি যার মধ্যে মানুষের ক্ষতি নিহিত। যা একজন মুসলমানের পক্ষে কখনো অনুসরণীয় হতে পারে না। বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন- 'পশ্চিমা সংস্কৃতির ডিমগুলো পঁচা।'

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরীর এক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট এক ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই বলুন দেখি এই নরম, কোমল ও চিকন টয়লেট পেপার তৈরিতে কোনো মারাত্মক কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় কি না? ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন, 'ডাক্তার সাহেব! এগুলো তৈরিতে নানারকম কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, কিছু কেমিক্যাল তো ক্ষতিকরের চূড়ান্ত, যার দ্বারা চর্ম রোগ, একজিমা এবং চামড়ার বর্ণ পরিবর্তনের মতো রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।'

আজকাল ইউরোপীয়রা টয়লেট পেপার ব্যবহার করছে। ফলে বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল, তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর সীমিত ছিল। বোর্ডের বক্তব্য হলো, বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং অন্যদিকে পানি ব্যবহার না করার কারণে এ ধ্বংসকারী ব্যাধিগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপ আমাদেরকে কাগজের আকারে যে তোহফা দিয়েছে তা আমাদের জন্য লাভজনক না ক্ষতিকর তার হিসাব করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।

ইউরোপীয়গণ যেহেতু ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু টয়লেট পেপারের ওপর নির্ভর করে এবং পানি ব্যবহার করে না, এজন্য টয়লেট পেপার তাদের জন্য ক্ষতিকর চিহ্নিত হচ্ছে। তবে যদি টয়লেট পেপারের সাথে সাথে পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের ক্ষতি অনেকটাই কমে যায়।

৬. রাসূল (স) ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিলা ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদিসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন, 'পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত।'

(সহীহ মুসলিম) কিন্তু ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পরিবর্তে টয়লেট পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে, যার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে- এর মধ্যে থেকে ইতোপূর্বে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বাদবাকী আরো কিছু বর্ণনা করছি।

এক ইউরোপীয় ডাক্তার 'কিনান ডিউস' পুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধনপূর্বক বলেন–

যদি আপনারা এরূপ জীবন যাপন করেন অর্থাৎ পায়খানার স্থানকে পানি ছাড়া টয়লেট পেপার দ্বারা পরিষ্কার করতে থাকেন, তা হলে আপনাদেরকে খুব শিগগিরই কয়েকটি রোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে– ১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ২. ভগন্দর অথবা ফিস্টুলা ৩. ভাইরাসজনিত রোগ ৪. চর্মের ঘা বা ইনফেকশন। প্রস্রাব ও পায়খানা থেকে ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে না। যার কারণে অবশিষ্ট ভারী মল ও আবর্জনা লোম ও দেহে আটকে নানারকম রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

পানি সৃষ্টিকূলের জন্য এক মহা নিয়ামত। এটা সমস্ত নাপাকীকে পাক বা পবিত্রতায় রূপান্তর করে। ইসলাম পবিত্রতার নিয়মকে এ পরিমাণ স্পষ্ট ও পাক বানিয়ে দিয়েছে যে, একে অমান্য করার সুযোগ নেই। এমনকি অমুসলিম বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণও এর প্রশংসা না করে পারেননি।

প্রাচ্যবিদ জন মিল এর বক্তব্য হলো: 'ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। সব ধর্ম এ হতে নিজেদের পবিত্রতার অধ্যায় পরিপূর্ণ করে। ইসলামের ইস্তিঞ্জার পন্থাও নজিরবিহীন। এর মাধ্যমে দেহের ওপর বর্জ্যের অণুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোনো শরীরকে পানি ছাড়া পরিষ্কার করা হয়, তবে অভিজ্ঞতা হতে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শরীরের সম্পূর্ণ অংশ কখনও পরিষ্কার হবে না, বরং নানা ব্যাধির বাহক হয়ে যাবে। আবার পানির ব্যবহারে শরীরের এ অংশের (লজ্জাস্থানের) তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা খুবই উপকারী হয়, যাতে এর দ্বারা ভগন্দর, গেজ, পাইলস ইত্যাদি হতে পারে না। যদি পানি ব্যবহার করা না হয় তাহলে পায়খানা-প্রস্রাবের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো ছাড়াও অন্য অঙ্গগুলোর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ে নানান রোগে।

ইস্তিঞ্জায় নিষিদ্ধ কার্যাবলি

রাসূল (স) ইস্তিঞ্জার ব্যাপারে অনেক নির্দেশনাবলি দিয়েছেন। প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশাবলি দিয়েছেন বিশেষ গুরুত্বের সাথে। এ ছাড়াও প্রস্রাবের সময় খাড়া হয়ে ও চলার সময় এবং পানিতে, রাস্তায় ছায়াপ্রদানকারী বা ফলপ্রদানকারী বৃক্ষের নিচে, বায়ুমুখী হয়ে গর্তের মধ্যে, গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ

করেছেন। আর গোবর, হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা এবং কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানির পাত্র হতে ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতে এবং বাম হাত দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে, পায়খানা প্রস্রাবের সময় পর্দার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব শিক্ষার মধ্যে অগণিত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। এসব উপকারিতা হতে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে–

● অত্যধিক পরিমাণে প্রস্রাবের ছিটা থেকে না বাঁচার ব্যাপারে হাদিসগুলোতে শাস্তির বাণী এসেছে এবং মুহাদ্দিসীন স্ব-স্ব সংকলিত কিতাবে এরূপ বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন, যাতে প্রস্রাব থেকে বাঁচা, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী প্রস্রাব ও তা থেকে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– প্রস্রাব থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা বেশিরভাগ কবর আযাব হয় প্রস্রাব থেকে আত্মরক্ষা না করার ফলে।

প্রাচ্যবিদ ড. জন মিল বলেন, উরুর ক্ষত ও ফাঙ্গাস, চর্ম ওঠা রোগ, মৃগী এবং এর পার্শ্বের এ্যালার্জী এবং বিশেষ অঙ্গের রোগী যখন আমার কাছে আসে তখন তার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হয় যে, সে কি প্রস্রাব হতে আত্মরক্ষা করে? এদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রস্রাব হতে আত্মরক্ষা করে না, পুনরায় দুরারোগ্য ও সমস্যা জটিল ব্যাধি নিয়ে আমাদের কাছে আসে। জিনসের প্যান্ট-এর চেইন ও বোতাম খুলে প্রস্রাব করার পর পুনরায় ইস্তিঞ্জা ছাড়া ততক্ষণাৎ বেঁধে নেয়ার অবস্থায় পেশাবের ফোঁটাগুলো দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলোর ওপর পড়তে থাকে, যার ফলে চর্মরোগ এবং অন্যান্য রোগ সৃষ্টি হয়।

● রাসূল (স) প্রস্রাবকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফকীহগণ বলেন, যদি সওয়ারীর ওপর আরোহণ রত অবস্থায় প্রস্রাবে চাপ দেয় তাহলে সওয়ারী থামিয়ে প্রথমে প্রস্রাব করবে। এভাবে যদি জামাতের সময় হয়ে যায় এবং প্রস্রাবে চাপ দেয় তাহলে প্রথমে প্রস্রাব করে ওযু করে তারপর জামাতে শরিক হবে। কোনো কাজ করার সময় প্রস্রাবের বেগপ্রাপ্ত হলে প্রথমে প্রস্রাব করে নিতে হবে। প্রস্রাবকে বাধাগ্রস্ত না করা এবং সময়মত প্রস্রাব করার মধ্যে চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে–

চিকিৎসার মূলনীতিতে রয়েছে যে, যখনই প্রস্রাব বা পায়খানার বেগ আসবে তখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। বেগবান প্রস্রাব পায়খানাকে বাধাগ্রস্ত করতে চিকিৎসাশাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত সিনিয়রগণ বলেন, জরুরি প্রয়োজনে (পায়খানা-প্রস্রাব)কে বাধাগ্রস্ত করলে নানান রোগ হয়; এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের। এ ছাড়া পাকস্থলী, স্নায়ু, গর্দান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো সময় জরুরি প্রয়োজনে বাধাগ্রস্ত করায় বমি ও মাথাঘোরা শুরু হয়ে যায়, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত।

রাসূল (স) স্রোতহীন পানিতে-প্রস্রাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা হলো–

● পুকুর, ডোবা, বিল ও ঝিলের বদ্ধ পানিতে যদি পায়খানা-প্রস্রাব করা হয়, তা হলে পানিতে জীবাণু ঢুকে সব পানি দূষিত ও ক্ষতিকর রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোনো পাখি, জীবজন্তু, মানুষ ইত্যাদি ঐ পানি পান করে তাহলে তারা বেশ কিছু মারাত্মক ও জটিল রোগের শিকার হয়ে যাবে। এরূপ পানি পানকারীর জ্বর, টাইফয়েড, ভাইরাসজনিত জণ্ডিস, অন্ত্রে কীটের ডিম্বাণুর জন্য প্রভৃতি ধ্বংসকারী রোগসমূহ সৃষ্টি করে।

● বদ্ধ পানিতে মূত্র ত্যাগ করা হলে মূত্র ছিটে শরীরে পড়ে, যা কিছু রোগের পক্ষে কাজ করে। আবদ্ধ পানিতে পেশাব করাতে এক প্রকারের ভাপ ওঠে যা পেশাবকারীকে কয়েক প্রকারের পীড়ায় আক্রান্ত করে। এ ভাপ-এর কারণে গন্ধ গ্রহণের শক্তি কমে যায়। মানুষ চোখের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং তা মস্তিষ্কের ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলে। এ সব কারণে নবী করিম (সা.) বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে কোনো লোকের কারণে প্রাণী অথবা অন্য কোনো মানুষের কোনোরূপ কষ্ট না হয় এবং ইসলামি সমাজ সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং রোগব্যাধি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকতে পারে।

● নবী করিম (সা.) প্রবাহিত পানিতেও মূত্র ত্যাগ করতে বারন করেছেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কারণ বর্ণিত হয়েছে। প্রবাহিত পানি যেমন সমুদ্র, নদী, খাল ইত্যাদির কূলে গ্রামের পর গ্রামের হাজারো মানুষ বসবাস করছে। বহু মানুষ ও প্রাণী এ পানি থেকে উপকার লাভ করে। যদি বর্জ্যের কারণে এ পানি ময়লাযুক্ত হয়ে যায় তাহলে জীবাণুর স্তূপ জমে এবং রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। যদি কোনো ব্যক্তি এ নদী বা খাল ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য পানি অতিক্রম করে, তখন তার শরীর যতখানি পানিতে ভিজে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ পানি দ্বারা এ্যালার্জী, ফোঁড়া, ক্ষত ইত্যাদিও ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও যখন কোনো ব্যক্তি প্রবাহমান পানিতে প্রস্রাব করে তবে তা থেকে দুর্গন্ধ ওঠে, যার ফলে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য নানান ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- রাসূল (সা.) চলাচলের স্থান ও রাস্তায় পেশাব করতে সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। রাস্তায় মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে এবং যখন রাস্তায় পেশাব করা হয় তখন পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের মাধ্যমে তা রাস্তায় চলাচলকারীদের দেহে সংক্রমিত হয়, যার দ্বারা শ্বাসের অসুবিধা হয়। এ ছাড়াও পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু যদি কারোর শরীরে পৌঁছে তাহলে হৃদরোগ, পেটের পীড়া, বাতরোগ হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- হাদিসসমূহ এবং ফিকহের কিতাবে ছায়া কিংবা ফল প্রদানকারী গাছের নিচে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কয়েকটি প্রাকৃতিক, ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক অপকারিতা রয়েছে। গাছের ছায়া লোকদের দাঁড়ানো ও বিশ্রামের স্থান। এখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা চূড়ান্ত রকমের অন্যায় এবং এ থেকে নিশ্চিতই খারাপ প্রভাব পড়ে। এ ধরনের গাছের নিচে উপবেশনকারীর নানান প্রকারের রোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফল প্রদানকারী বৃক্ষ যেখানে লোকদের দাঁড়ানো ও আরাম করার স্থান, এটা ফল আহরণের স্থানও বটে এবং লোকেরা তার ছায়ায় বসে ফল খায়। যদি সেখানে আবর্জনা করা হয় তাহলে সেখানে বসে খাওয়া কষ্টের হবে এবং পথচারীরা দুর্ভোগ পোহাবে। তাছাড়া ফলজ বৃক্ষ থেকে নিজে নিজেও ফল নিচে পড়ে থাকে। যদি ঐ বৃক্ষের নিচে পায়খানা পেশাব করা হয় তাহলে ঐ ফলগুলো অবশ্যই এ ময়লায় পড়বে। যে কারণে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবে না এবং যদি কেউ এ ফল খেয়ে ফেলে, যেমন অবুঝ শিশু ইত্যাদি, তাহলে সেও অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাবে।
- হাদিস এবং ফিকহে বাতাসের দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে।

  যদি বাতাসমুখী হয়ে পেশাব করা হয় তাহলে বাতাস প্রবাহের কারণে ঐ পেশাব উল্টা ছিট্‌কে শরীর, কাপড়-চোপড়ের ওপর পড়বে, যার ফলে দেহ ও কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। এর ফলে এ পেশাবের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে এ্যালার্জি, খোস-পাঁচড়া, রক্তদূষণ এবং আরো কয়েক প্রকার চর্মরোগ সৃষ্টি করবে। যদি বায়ুর দ্বারা পেশাব উল্টে মুখ এবং চোখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে মারাত্মক ক্ষতি হয়। যেমন– চোখে ক্ষত হবে, চোখে চুলকানী হবে, চোখ থেকে পানি পড়বে এবং এর সাথে সাথে চোখের নানা রোগ সৃষ্টি হবে। যদি চিকিৎসা না হয়, তাহলে এ রোগগুলো বেড়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। যদি বায়ুমুখী

হয়ে পেশাব করা হয় এবং পেশাব উল্টে মুখে প্রবেশ করে তা হলে তা দ্বারা কয়েক প্রকারের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন– মুখের রোগ, মাড়ির পুঁজ, দাঁতের রোগ ইত্যাদি।

- রাসূল (স) গর্তের মধ্যে মূত্র ত্যাগ করতে মানা করেছেন। মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মারজাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কখনোই গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। (মিশকাতুল মাসাবিহ)। গর্তাদির মধ্যে প্রস্রাব করার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত অপকারিতা রয়েছে। যদি গর্তাদির মধ্যে পেশাব করা হয় তাহলে গর্তের বিষাক্ত প্রাণী বাইরে বের হয়ে ক্ষতি করার আশংকা থাকে। অনেক মাটির গর্ত এমনিতেই হয়ে থাকে এবং সে গর্তাদির মধ্যে এসিড এবং নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে থাকে। যদি এর মধ্যে পেশাব করা হয়, তাহলে পেশাব যেহেতু নিজেই এক প্রকারের এসিড সেহেতু অন্য প্রকারের এসিডের সাথে এটি মিলে বাষ্প হয়ে মানবদেহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।
- নবী করীম (স) গোসলের জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আরো ইরশাদ করেছেন ঃ এর ফলে অগণিত কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, গোসলের স্থানে পেশাব না করা উচিত। কেননা এর ফলে জ্ঞান ও মেধার ওপর প্রভাব পড়ে স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এবং কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। (Science and Health) 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' নামে একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিনে বর্ণিত হয়েছে ঃ গোসলের স্থানে পেশাব করার ফলে যৌন রোগ বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা মানুষ শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গোসলের স্থানে মূত্র ত্যাগ করার কারণে আরো অনেক ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
- হযরত জাবির (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করবে না। (বায়হাকী শরীফ)। ইসলাম বসে মূত্র ত্যাগের নির্দেশ দান করে। কারণ দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে অগণিত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে থাকে। যেহেতু পেশাব হতে জীবাণু বের হয় এবং অনেক সময় এর মধ্যে অনেক রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া, মূত্রাশয়ে জীবানুর ইনফেকশন ইত্যাদি)-এর কারণে পুঁজ জমা হয়। দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করলে এর ছিটা শরীর ও পোশাককে ময়লাযুক্ত করে এবং এর ফলে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। দাঁড়িয়ে পেশাব করায় প্রোস্টেট গ্রন্থির ওপর খারাপ প্রভাব

Contents

পড়ে এবং তা প্রসারিত হয়ে বেড়ে যায় এবং যার কারণে মূত্র বন্ধ হয় যায়। এমনকি মূত্র ফোঁটা ফোঁটা আসে এবং ফোঁটাও পাতলা হয়ে যায়। আরো কিছু রোগ জন্ম নেয়।

- রাসূল (স) গোবর, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- গোবর (প্রাণীর বর্জ্য), হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ।' (সহীহ্ মুসলিম) গোবরের মধ্যে অগণিত ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। কারণ এটা এক প্রাণীর বর্জ্য (পায়খানা) এবং সকল বর্জ্যেই জীবাণু থাকে। গোবরের মধ্যে টিটেনাস এবং টাইফয়েড-এর জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। যদি গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয় তাহলে জীবাণু দেহে ঢুকে অসুখ হয়। এছাড়াও এর দ্বারা লজ্জাস্থানের অনেক পীড়া হয়ে থাকে। যেমন- খোস-পাঁচড়া, পুঁজপড়া, লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ইত্যাদি।

  গোশত খেয়ে যখন হাড় বাইরে ফেলে দেয়া হয় তখন তাকে প্রাণীরা (কুকুর-বিড়াল) চেটে খায়। কিছু প্রাণীর লালার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে। যেমন- কুকুরের লালায় এক বিশেষ ধরনের জীবাণু থাকে, যা তার ভক্ষণকৃত হাড়ে সংক্রমিত হয়। তাছাড়া হাড়ের ওপর মাটি, ময়লা, ধুলাবালি ও দুর্গন্ধ জমে যায় এবং এ ধরনের ময়লা-ধুলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যদি এ হাড় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে যাবতীয় জীবাণুর সাথে সাথে কুকুরের বিশেষ জীবাণুও দেহের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। যার ফলে রক্তদূষণ, হার্ট, পেট, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ হয়।

  এছাড়া হাড়ের উপরিভাগ শক্ত, অসমান ও ধারালো হওয়ায় এর দ্বারা মানবদেহ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাড়ে এমন রোগ জীবাণু থাকে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। ইস্তিঞ্জা করার সময় এদের মাধ্যমে ক্ষতি হতে পারে।

- নবী করিম (স) কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ, মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় কিবলার দিকে মুখ পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (স) আমাদেরকে মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন।' (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

  ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করার উপকারিতা রয়েছে। ডা. ডারভীন, ডা. লিভবীব, ডা. আলেক্সান্দ্রা-এর গবেষণা অনুযায়ী 'কসমস ওন্ড' এর

মানবব্যবস্থা জীবনের জন্য সহযোগী। কাবার চারদিক থেকে বের হওয়া ধনাত্মক রশ্মি (Positive Ray) যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পেশাব, পায়খানা ও থু থু পুরোপুরি ঋণাত্মক রশ্মি (Negative Ray) কাবার দিকে নিক্ষেপ করলে মানুষের জন্য নানান ক্ষতির কারণ হয়। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট 'ডাক্তার কামিন বীম' এ কথাকে নিজ পরীক্ষা জীবনের অংশ বানিয়েছেন যে, মুসলমানদের কা'বার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে ধনাত্মক রশ্মি (Positive Ray) পুরো সৃষ্টি জগতের ওপর পড়ছে এবং সেদিকে ঋণাত্মক রশ্মি (Negative Ray) থু থু, পেশাব, এবং পায়খানা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা ক্ষতির কারণ।

- নবী করিম (স) ইরশাদ করেন ঃ 'পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাত্র হতে পানি ডান হাত দ্বারা ঢালো এবং পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করো। সাবধান! ইস্তিঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করো না। যখন কোনো লোক পায়খানা-পেশাবের জন্য যায়, তখন লজ্জাস্থান নিজ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

  রাসূল (স) এর এ বাণীর মধ্যে কয়েক প্রকারের প্রাকৃতিক, চিকিৎসাগত এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। ইস্তিঞ্জা শুধু বাম হাত দিয়েই করা উচিত। এর কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। ডান হাত থেকে ধনাত্মক রশ্মি (Positive Ray) এবং বা হাত থেকে ঋণাত্মক রশ্মি (Negative Ray) বের হয়। যদি ইস্তিঞ্জার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে শরীরের রশ্মির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর খারাপ প্রভাব মস্তিষ্ক তথা সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) এর ওপর বেশি পড়ে। এ ছাড়াও যেহেতু ডান হাত দ্বারা খানা খাওয়া হয় তাই যদি ইস্তি ার জন্যও ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে খানা খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহারের সময় দুর্গন্ধ ও জীবাণু ছড়ানোর বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

- মল-মূত্র ত্যাগের পর নবী করিম (স) সর্বদা মাটিতে হাত ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলতেন। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসাবিজ্ঞানগত উপকারিতা রয়েছে। মল-মূত্র ত্যাগের পর উভয় হাত ধৌত করা রাসূল (স) এর সুন্নত। এর দ্বারা মানবদেহের অনেক উপকার সাধিত হয়ে থাকে।

যেমন ঃ আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দিয়ে ধরি। তাতে হাত খালি থাকে। হাতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ জীবাণু অথবা বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যাল থাকে যা আমাদের

Contents

হাতকে ময়লাযুক্ত করে। যদি হাত না ধুয়ে খানা খাওয়া হয়, কিংবা খাবারের প্লেটে হাত দেওয়া হয় কুলি করা হয়, নাকে পানি দেয়া হয়, তাহলে এ সকল জীবাণু সহজে আমাদের খাবার, মুখ ও নাকের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে এবং দেহকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী হাত ধোয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু আমাদের দেহকে আক্রান্ত করতে না পারে। আমেরিকার স্বনামধন্য অধ্যাপক 'ডাক্তার শাহেদ আতহার' লিখেছেন :

"Hand washing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However non-Musilm did not know that hand washing is so important it has been ordered in the Quran 1400 years ago." (Reference : Health guidelines from Holy Quran and Sunnah. (p-61)

'বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে জীবাণু ছড়ানো রোধ করার জন্য হাত ধোয়ার ওপরে জোর দেয়া হয়েছে। অথচ অমুসলিমদের জানা নেই যে হাত ধোয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার নির্দেশ ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র আল-কুরআনে দেয়া হয়েছিল।'

যখন আমরা হাত ধুই তখন আঙুলের মধ্য থেকে বের হওয়া রশ্মিসমূহ এমন এক বৃত্ত তৈরি করে যার ফলে আমাদের ভেতরের বৃত্তশীল বিদ্যুতের শৃঙ্খলার বেগ বেড়ে যায় এবং বিদ্যুতের রশ্মি এক পর্যায়ে হাতের মধ্যে আসে। এ কাজের মাধ্যমে হাত সুন্দর ও পবিত্র হয়।

নবী করিম (স) এর অভ্যাস ছিল এই যে, মল-মূত্র ত্যাগের পর তিনি হাত মাটি দ্বারা ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলতেন। যাতে হাতে লাগানো জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কিছু জীবাণু এমনও হয় যে সাধারণ পানি দ্বারা তা ধ্বংস হয় না। এ জন্য হাতগুলোকে মাটি অথবা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

মাটি উচ্চ পর্যায়ের জীবাণু ধ্বংসকারী অ্যান্টিসেপটিক। এটা কুকুরের জীবাণুও (যা সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণু) ধ্বংস করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখে। এটি সাধারণত জীবাণুগুলোকে দ্রুত গতিতে ধ্বংস করে দেয়। মাটিতে ঘষে হাত ধোয়া উত্তম প্রাকৃতিক নিয়মও বটে।

মিসওয়াক-এর উপকারিতা

প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম যেমন মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির নির্দেশ প্রদান করে তেমনি মুসলমানদের দেহ ও পোশাকের পবিত্রতারও শিক্ষা দেয়। যদি ইসলামি পবিত্রতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে তার মাপকাঠি বিজ্ঞানের পন্থার চেয়েও উত্তম ও সুন্দর হিসেবে চোখে পড়বে। ইসলামে নামাযের আগে মিসওয়াক ও ওযুর নির্দেশ রয়েছে। এটা আত্মিক ও শারীরিক উভয় দিকের উপকার সাধন করে। এ জন্য শুধু মিসওয়াককে 'আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা' প্রদান করা হয়।

ধর্মপ্রাণ একজন মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে একদিনে ১৫ বার মুখ পরিষ্কার করে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার যে, মুসলিম নামাযী ব্যক্তির মুখ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। নামাযীকে নামাযের মধ্যে মহান স্রষ্টা ও মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা করতে হয়। এ কারণে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া অত্যাবশ্যকীয় কাজ। মুখ পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ আসে। সঙ্গী ও পাশের নামাযী বিরক্ত হতে পারেন। এ ছাড়াও ময়লা মুখ দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণগান ও ইবাদত করার দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং নামাযে খুশু-খুযু ব্যাহত হয়। মিসওয়াক ও পানি দ্বারা মুখ যদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায় তাহলে এমন স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয় যার দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত ও গুণগানের মধ্যে তৃপ্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য মিসওয়াক করলে দাঁত মজবুত ও উজ্জ্বল হয়। দাঁতে নানা রোগের আশঙ্কা থাকে না। চোয়াল শক্ত হয়। আস্বাদন শক্তি অনেক বেড়ে যায়। গলা বিভিন্ন রোগ থেকে বেঁচে থাকে। মিসওয়াক সম্পর্কে কয়েকটি হাদিসের বিশ্লেষণ হলো–

- মহানবী (স) মিসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি বলেছেন, মিসওয়াককে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কারণ এর মধ্যে পনেরোটি সৌন্দর্য রয়েছে।

  ক. মুখকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে

  খ. আল্লাহ তাআলা খুশি হন।

  গ. শয়তান অসন্তুষ্ট হয়

  ঘ. প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়

  ঙ. রসূল (স) এর সুন্নত আদায় হয়

চ. ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়ে যায়

ছ. পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে ওঠে

জ. গরমের কষ্ট দূর হয়

ঝ. মাথা ব্যথা দূর হয়

ঞ. মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়

ট. কফ কেটে যায়

ঠ. মাড়ি শক্ত হয়

ড. দারিদ্র্য এবং সংকীর্ণতা দূর হয়

ঢ. মিসওয়াক শেষে নামায আদায়ে সওয়াব ষাট গুণেরও বেশি।

ণ. মিসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালোবাসেন।

- হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করতে অলসতা করো না। কারণ এটা মাড়ির দাঁতের ব্যথা দূর করে, দাঁত উজ্জ্বল থাকে এবং এর ব্যবহারে স্মৃতিশক্তিও বেড়ে যায়।
- রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেন, 'জুমুআর দিনে মিসওয়াক করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।'
- হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন, 'নবীদের গুণাবলির মধ্যে একটি হলো মিসওয়াক করা।'
- নবী করীম (স) আরো ইরশাদ করেন, 'খাবারের পর মিসওয়াক করা দুজন কম বয়সী গোলাম আযাদ করার চাইতে উত্তম।'
- নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করে নামায আদায় করা ঐ নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ সওয়াব বেশি, 'যে নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা হয়নি।'
- নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমীন মিসওয়াক-এর এত ফযিলত বর্ণনা করেছেন যে আশঙ্কা হতো মিসওয়াক আমার উম্মতের ওপর ফরয করা হয়ে যাবে।
- নবী করীম (স) বর্ণনা করেন, 'তোমরা মিসওয়াক দ্বারা নিজেদের মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ, যেহেতু এটি মুখের হক।'
- হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যদি আমার নিকট কষ্ট মনে না হতো যে মিসওয়াক করা উম্মতের ওপর কঠিন হয়ে

যাবে, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার হুকুম (আবশ্যকীয়) করে দিতাম। (সহীহ মুসলিম)

- রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, 'মিসওয়াক করা নবীগণের সুন্নতের মধ্যে অন্যতম সুন্নত।' (সুনানে তিরমিযী)
- রাসূল (স) মিসওয়াক করার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন –

ক. মিসওয়াক নবীগণের পন্থা এবং তাদের অনুসরণ ও তাদের হিদায়াত তলব করা।

খ. মিসওয়াকারীর সাথে ফেরেশতাগণ মুসাফাহা করে এবং মহত্ত্ব ও উজ্জ্বলতার কারণে তার আগে পিছে অবস্থান করে।

গ. মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

ঘ. মিসওয়াককারীর সাথে সাথে ফেরেশতাগণ ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত গমন করেন।।

ঙ. সকল ফেরেশতা এবং আরশ বহনকারীগণ মিসওয়াককারীর জন্য প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

চ. মিসওয়াককারীর জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকবে, যাতে সে যে কোন দরজা দিয়ে বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে।

ছ. কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে, তাদের সংখ্যাসম নেকী মিসওয়াককারীদের দেয়া হবে।

জ. মিসওয়াককারীর জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।

ঝ. সকল নবী ও রাসূলগণ মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ঞ. মিসওয়াককারীর কোন কিছু মুখস্থ করার শক্তি বেড়ে যায়।

ট. আল্লাহ তাআলা মিসওয়াককারীর প্রতি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন।

ঠ. মিসওয়াককারীর জন্য খাবার সময়ে শক্ত গোশতও নরম হয়ে যায়।

ড. মিসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের ব্যথা দূর হতে থাকে।

ঢ. মিসওয়াককারীর কবর মিসওয়াকের বরকতে প্রশস্ত করা হবে।

ণ. আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত মিসওয়াককারীর ঘরে অবতীর্ণ হয়।

ত. মিসওয়াককারীর সকল প্রয়োজন পূরণ হয়।

থ. প্রত্যেক দাঁত এবং আঙ্গুলের করের সংখ্যানুপাতে পাঁচ পাঁচটি নেকী মিসওয়াককারীর আমলনামায় (মিসওয়াক করার কারণে) লেখা হয়।

Contents

দ. মৃত্যুর ফেরেশতা রূহ কবজ করার জন্য মিসওয়াককারীর নিকট খুবই সুন্দর আকৃতিতে উপস্থিত হয়, যেরূপে নবী-রাসূলদের নিকট আসে।

ধ. মৃত্যুর ফেরেশতা মিসওয়াককারীর রূহ এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যেন তিনি পবিত্র থাকেন।

ন. দুনিয়া থেকে পুনরুত্থানের পূর্বে আল্লাহ তাআলা মিসওয়াককারীকে সুস্বাদু শরাবে তুহুর দ্বারা আপ্যায়ন করবেন।

প. মৃত্যুর পর মিসওয়াককারীর কবরে দুনিয়ার সমান প্রশস্ততা তৈরি করা হবে।

ফ. জমিনের কীটপতঙ্গ এবং কষ্টদায়ক প্রাণী মিসওয়াককারীকে কষ্ট দেবে না।

ব. কিয়ামতের দিন মিসওয়াককারীদের নবীদের মতো পোশাক পরানো হবে।

ভ. আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে মিসওয়াককারীদের নবীদের মতো সম্মান দেওয়া হবে।

ম. আল্লাহ তাআলা মিসওয়াককারীদের নবী ও শহীদদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

য. শেষ বিচারের দিন আমলের দাঁড়িতে মিসওয়াককারীর পাল্লা ভারী থাকবে।

র. মিসওয়াককারীর জন্য হযরত ইসমাঈল (আ) এর প্রতিবেশী হিসেবে জান্নাতে মহল বা বাসস্থান তৈরি হবে।

ল. মিসওয়াককারী রাসূল (স) এর সুপারিশ দ্বারা ভূষিত হবেন।

শ. সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, মিসওয়াককারী আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

- রাসূলুল্লাহ (স) নবীগণের দশটি সুন্নাত বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিসওয়াক করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেছেন ঃ 'মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ।'
- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন, 'নবী করীম (স) দিন বা রাতে যখনই শোয়া থেকে উঠতেন, তখন ওযু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন।' (সুনানে আবু দাউদ)
- হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেন, 'যখন বান্দা মিসওয়াক করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার তিলাওয়াত খুব মনোযোগ সহকারে শোনে, অতঃপর তাঁর খুব নিকটে এসে যায়, এমনকি তার মুখের ওপর রেখে দেয়। কুরআন-মাজিদের যে শব্দই এ নামাযীর মুখ থেকে বের হয় সোজা

ফেরেশতার পেটে চলে যায়। এ জন্য তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মুখ সাফ রাখ।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ)

- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেন ঃ "মিসওয়াক করে দু'রাকাত নামায পড়া, মিসওয়াক ব্যতীত ৭০ রাকাত পড়ার চেয়ে উত্তম।" (যাওয়ায়েদ)
- হযরত শুরাইহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট আরজ করলাম, রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? সাইয়েদা আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূল (স) সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।' (সহীহ মুসলিম)
- হযরত যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) নিজ ঘর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি মিসওয়াক করতেন। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ)

মানবতার পথপ্রদর্শক মহানবী (স) দুনিয়ায় এসেছিলেন অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ইতিহাস মহানবী (স) এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম ছিল, অক্ষম আছে এবং অক্ষম থাকবে। রাসূল (স) জীবনের যে নিয়ম পেশ করেছেন তা তুলনাহীন। রাসূল (স) মানব জীবনের কোন প্রাথমিক প্রয়োজনই ছেড়ে দেননি। তদুপরি রাসূল (স) শুধু মৌখিক হিদায়াতই দান করেননি, বরং আমলের দিক থেকেও সাবধান করেছেন। নবী করীম (স) নিজে আমল করে সকল লোকের জন্য নিজ আমলকে আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার তাঁর সুন্নাতের ওপর আমলকারীদের জন্য অনেক প্রতিদান ও সওয়াবের সুখবরও দান করেছেন।

বর্তমানে ব্রাশ (Tooth Brush) এবং পেস্ট (Paste) ব্যবহারের এক নতুন সংস্কৃতি চালু হয়েছে। এই পেস্ট এবং ব্রাশ যেমন উপকার করে তেমন ক্ষতিও করে। এরূপ নতুন সংস্কৃতির চমকে আকৃষ্ট লোকজন সুলভ, সহজ, উপকারী এবং প্রাকৃতিক জিনিস মিসওয়াককে ত্যাগ করে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। লোকেরা দাঁত, মাড়ি, গলনালীর রোগের শিকার হয়ে দেহের বিভিন্ন রোগের কারণ নিজেরাই সৃষ্টি করছে।

রাসূলুল্লাহ (স) এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা হলে দুনিয়ায় দাঁতের রোগ সৃষ্টি হতো না। লোকেরা এত কষ্টও ভোগ করত না। রাসূলুল্লাহ (স) মিসওয়াক এর ব্যবহারের ওপর এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এজন্য যে, এর মধ্যে চিকিৎসাসহ বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মিসওয়াক

মিসওয়াকনাশক জীবাণু

মিসওয়াক জীবাণু ধ্বংসকারী এবং এটা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। এর ব্যবহারে মুখের ভেতরের জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। মিসওয়াককারী রোগ থেকে বেঁচে থাকেন। নতুন গবেষণা অনুযায়ী জানা যায়, মুখে এমন কিছু জীবাণুর সৃষ্টি হয় যা প্রচলিত ব্রাশ এবং পেস্ট দ্বারা দূর হয় না বরং সেগুলোকে শুধু মিসওয়াকের মাধ্যমেই ধ্বংস করা যেতে পারে। মিসওয়াক জীবাণু ধ্বংসকারী অ্যান্টিসেপটিক এর কাজ করে।

মিসওয়াক ও মস্তিষ্কের সুস্থতা

চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে মিসওয়াক ব্যবহার দ্বারা মস্তিষ্কের সুস্থতা অটুট তাকে। যদি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে দাঁত ও মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যার দ্বারা চোয়াল ও মাড়িতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের রোগের কারণ হয় এবং এর ফলে হৃদরোগও হয়ে থাকে।

মিসওয়াক ও দাঁতের স্বাস্থ্য

মানুষ খাবার খায়, পানি পান করে এবং বহু রকমের জিনিস খেয়ে থাকে। আর খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের মাঝে জমতে থাকে, যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করার দ্বারা বের হয় না। ফলে দাঁতে দুর্গন্ধসহ বহু রোগের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, এভাবে দাঁত ময়লাযুক্ত হলে খারাপ গন্ধ আসতে থাকে। নিকটে উপবেশকারী ব্যক্তির মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক হয়। পরে দাঁতের সাথে মাড়িও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাড়িতে পুঁজ জমা হয়, যার দ্বারা অসহ্য রকমের ব্যথা শুরু হয়। এর প্রভাবে দাঁতের মাড়ি মারাত্মক আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্যা আরো বড় হয়ে গলায়ও প্রভাব ফেলে। ফলে সর্দি-কাশি, জ্বর ইত্যাদির প্রকোপ বেড়ে যায়। বুকের ভেতর কফ তৈরি হয়। যার দ্বারা মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয়। এর প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। একইভাবে এই পুঁজ ও ঘা– এর কারণে কান ও পাকস্থলীও প্রভাবিত হয়। এসব জীবাণু দেহের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নাম জীবন। জীবনে যদি সুস্থতাই না থাকে তাহলে জীবনের মূল্য নেই। তাই মিসওয়াক ছাড়া সুস্থ থাকার উপায় নেই। মিসওয়াক ব্যতীত পুঁজ, দূষণ ও কঠিন জীবাণু কখনো দূর হয় না।

মিসওয়াক ও গলনালী

যেসব রোগীর গলানালী আক্রান্ত হয়, তারা টনসিলের রোগী। এ সব রোগী নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করলে সুস্থ হয়ে যায়, এরূপভাবে যদি কোনো রোগীর গলার নালী বড় হয়ে যায় তাহলে তিনি শাহতুত-এর শরবত এবং নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক করলে আরাম পেয়ে থাকেন।

মিসওয়াক ও মুখের ঘা

কখনো কখনো গর্মি, দুর্গন্ধ এবং অদৃশ্য জীবাণুর কারণে মুখের ভেতর ফোঁড়া হয়। এগুলো কখনো প্রকাশ পায় আবার কখনো গোপন থাকে। এটা খুবই কষ্ট ও ক্ষতিকর হয়। এ জীবাণুগুলো পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে, পুরো মুখকে আক্রান্ত স্থলে পরিণত করে। ফলে খাবার গ্রহণ করা মুশকিল ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রতিদিন নিয়মিত তাজা মিসওয়াক করলে এবং লালা উত্তমরূপে মুখে মিলে যাবার ফলে এ রোগ হয় না। আর যদি হয়ও তবে নিয়ম মাফিক মিসওয়াক করলে রোগী সুস্থ হয়।

মিসওয়াক ও চোখ

দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা চোখ ও দাঁতের বিভিন্ন রোগের অন্যতম কারণ। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাবারের কণা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। দাঁতের সাথে চোখের বিশেষ সংযোগ থাকায় চোখের রোগ সৃষ্টি হয়। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে এবং একসময় চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। দাঁতের যত্ন না নেয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া কখনও কাম্য নয়।

মিসওয়াক ও কান

কিছু রোগী আবার কানের প্রদাহ, পুঁজ এবং ব্যথায় কাতর থাকে। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দাঁত পরিষ্কার না রাখায় এদের মাড়িতে পুঁজ জমে পুরো মুখ দুর্গন্ধে ভরে যায়। যখন মাড়ির চিকিৎসা করা হয় এবং নিয়মিত তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা হয় তখন কানও ভালো থাকে।

মিসওয়াক ও পাকস্থলী

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষত বর্তমানে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন (তিনজনে একজন) পেটের রোগে আক্রান্ত। মিসওয়াক না করার কারণে মুখে দুর্গন্ধ হয়, মাড়িতে পুঁজ জমা হয় এবং কিছু অদৃশ্য জীবাণুও মুখে সৃষ্টি হয়। এ

অবস্থায় যখন খাবার খাওয়া হয়, তখন খাদ্যের সাথে মাড়ির পুঁজও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ফলে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়। মাড়ির পুঁজের কারণে ভক্ষিত অংশ ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যে কারণে পাকস্থলী ও জঠরের রোগ সৃষ্টি হয়। যদি জঠর ও পাকস্থলীর রোগের চিকিৎসার পরে নিয়মিত মিসওয়াক করা যায়, তাহলে রোগের দ্রুত নিরাময় হয়।

মিসওয়াক এবং কফ-কাশি

এমন রোগী যার কফ আটকে গেছে, সে যদি মিসওয়াক করে তবে ঐ কফ ভেতর থেকে বের হওয়া শুরু হয় এবং রোগী হালকা অনুভব করে। প্যাথলজিস্টদের মতে, সার্বক্ষণিক সর্দির জন্য মিসওয়াক প্রতিষেধকের কাজ করে। এমনকি মিসওয়াকের স্বতন্ত্র ও বিধিমত ব্যবহারে নাক ও গলার অপারেশনের অনেকাংশে ফুরিয়ে যায়।

মিসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ

নিয়মিত মিসওয়াকে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এক ব্যক্তির মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসত। তিনি বিভিন্ন প্রকার ভালো ভালো টুথপেষ্ট এবং মিনজান ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে অনেক ওষুধও ব্যবহার করেন; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। পরে একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তিনি পিলুর ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করেন। নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। মিসওয়াকের পুরাতন লোম ফেলে প্রত্যহ নতুন মাথা দ্বারা মিসওয়াক করতে থাকেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন।

মিসওয়াক ও বিভিন্ন রোগ

একজনের গলা ও ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছিল এবং একই সাথে ঘাড় ফুলা ছিল। গলার আওয়াজও ছোট হয়ে আসছিল, মেধাশক্তিও কমছিল, এর সাথে মাথাও ঘুরছিল। এ ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ চিকিৎসক ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু সবই ফলহীন প্রমাণিত হলো। কারো পরামর্শে তিনি নিয়মমাফিক মিসওয়াক করতে থাকলেন। এভাবে যে, মিসওয়াককে দু'টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করেন এবং এ পানি দ্বারা গড় গড় করতেন। এ ছাড়াও যেখানে ফুলা ছিল সেখানে কিছু ওষুধের প্রলেপও দিয়েছেন। এ চিকিৎসা বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। একে বিশ্লেষণ করা হলে জানা যায় তার থাইরয়েড গ্লান্ড ইনফেকশন ছিল; যার প্রভাব সারা দেহের ওপর পড়েছিল। এই মিসওয়াক এর চিকিৎসা দ্বারা তার এ রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও হার্টের ঝিল্লি

প্রখ্যাত হাকীম এস.এম ইকবাল আখবারে জাহান পত্রিকায় লিখেন : এক রোগীর হার্টের ঝিল্লিতে পুঁজ ছিল। সে চিকিৎসা করাচ্ছিল; কিন্তু কোনো আরোগ্য হচ্ছিল না। সর্বশেষে হার্টের অপারেশন করে পুঁজ বের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজ আবার জমে গেল। সকল দিক থেকে হতাশ হয়ে ঐ রোগী আমার নিকট আসলো। আমি তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তার দাঁতের মাড়িতে পুঁজ আছে এবং এই পুঁজ হার্টের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এ পরীক্ষা ডাক্তারগণ গ্রহণ করে নিলেন। হার্টের অপারেশনের পরিবর্তে এর দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং তাকে পিলুর মিসওয়াক করতে বলা হলো। যার ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

টুথ ব্রাশ

বিভিন্ন পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত, যে টুথ ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে জীবাণু জমা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর একই ব্রাশ দু'বার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হওয়ার আশু আশঙ্কা থাকে। পানি দ্বারা পরিষ্কার করার ফলে ঐ জীবাণু পরিষ্কার হয় না বরং তা বাড়তে থাকে। এছাড়া ব্রাশ-এর ব্যবহারে দাঁতের ওপরের ঔজ্জ্বল্য এবং সাদা আবরণ উঠে যায়। এ কারণে দাঁতের মাঝের ফাঁকাও বেড়ে যায় এবং মাড়ির স্থান ছুটে যেতে থাকে। একই কারণে খাদ্যের যে অংশগুলো দাঁতের ফাকে আটকে থাকে তা দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অবশেষে তা সারা দেহে রোগের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষার জন্য রাসূল (স) এর সুন্নতের ওপর আমল করা দরকার। অর্থাৎ সর্বদা সকাল-সন্ধ্যা মিসওয়াক করলে বজায় থাকবে সুস্বাস্থ্য।

বিভিন্ন প্রকার মিসওয়াক

নিয়মিত মিসওয়াক-এর জন্য সেসব গাছের ডাল উপযুক্ত, যার আঁশ নরম হয়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মাড়ির ক্ষতি হয় না। সর্বোত্তম এবং উন্নতমানের মিসওয়াক হলো– ১. পিলু ২. নিম ও বাবলা ৩.কানীর।

১. পিলু

পিলুর মিসওয়াক রাসূল (স) এর সুন্নাত। হযরত আবু খাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি ঐ দলের মধ্যে ছিলাম যারা রাসূল (স) এর খিদমতে হাজির ছিল। রাসূল (স) আমাদের মিসওয়াক করার জন্য পিলু গাছের লাকড়ি দিলেন। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ) পিলুর মিসওয়াক নরম ও আঁশযুক্ত হয়। এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও

ফসফরাস থাকে। বেশির ভাগ অনুর্বর, উষর, বিরাণ ভূমি ও জঙ্গলে এটি হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত, যে সব বস্তু মস্তিষ্কের খোরাক যোগায় এবং উপকার করে, তার মধ্যে ফসফরাসও রয়েছে। পিলুর মিসওয়াকে বিদ্যমান ফসফরাস লালা এবং লোমকূপের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়। ফলে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে, সুস্থ থাকে।

২. নিম ও বাবলা

বহুল পরিচিত নিম গাছের মিসওয়াক অনেক উপকারী। এতে দাঁতের সামগ্রিক রোগের প্রতিরোধক চিকিৎসা রয়েছে। এরপর বাবলার মিসওয়াকের মর্যাদা। এর দ্বারা দাঁত সুন্দর পরিষ্কার হয়। এটা দাঁতকে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ থেকে রক্ষা করে। মনে রাখতে হবে, মিসওয়াক প্রয়োজন মাফিক তাজা হওয়া দরকার। যদি প্রথমে শক্ত জাতীয় মিসওয়াক ব্যবহার করতে হয়, তবে কঠিন আঁশগুলো কেটে দাঁতের দ্বারা নতুন মাথা চিবিয়ে আঁশ বানিয়ে নিতে হবে।

৩. কানীর

কানীর দুপ্রকারের হয়ে থাকে। সাদা ফুলবিশিষ্ট এবং লাল ফুলবিশিষ্ট। এ জাতের গাছ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পার্ক, উদ্যান ইত্যাদিতে জন্ম হয়ে থাকে। এর মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা দাঁতের সব কষ্ট, পাইরিয়া ইত্যাদি দূর হয় দুরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে যায়। এ মিসওয়াক ঝাঁজালো হয়ে থাকে কিন্তু এই ঝাঁজ দাঁতের জন্য সীমাহীন উপকারী। ডাক্তারগণ এটিকে দাঁতের ঔজ্জ্বল্য, স্থায়িত্ব এবং পাইরিয়ার মতো রোগের জন্য খুবই উপকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মিসওয়াক এমন এক ব্যবস্থা যা সকল নবীর সুন্নাত এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক প্রতিরোধক ও নিরাময়কারী।

ওযুর গুরুত্ব

পবিত্রতা অর্জন

পবিত্রতা অর্জন ইসলামের একটি অনুষঙ্গ। রাসূল (স) বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ"। যে কারণে একজন মুসলমানের শরীর ও পোশাক পবিত্র হওয়া একান্ত জরুরী। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম উপায় ওযু। নামাযের পূর্বে ওযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৈহিক ও আত্মিক পবিত্রতার জন্য ওযু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ইবাদতের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

ওযুর একটি দৃষ্টান্ত

একবার এক অমুসলিম বিজ্ঞানী এক মুসলমানকে ওযু করতে দেখেন। তিনি দেখলেন, কব্জি থেকে কনুই অংশ ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানি নিচ থেকে নয় বরং কনুই থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি এ পন্থা দেখে বড়ই প্রভাবিত হলেন। এরপর তিনি মাথা ও ঘাড়ের ওপর মাসেহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, মাথা ও ঘাড় ধোয়া হলো না, যাতে উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাথা ও ঘাড় না ধুয়ে হাত বুলালেন অর্থাৎ, মাসেহ করলেন যাতে প্রশান্তি ছাড়াও শিরার মধ্যে কম্পনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ধোয়ার দ্বারা হয় না।

মানুষের শারীরিক গঠন অনুযায়ী কোমর ও ঘাড়ের সম্পর্ক শ্লেষার উৎস স্থলের সঙ্গে এবং মস্তিষ্ক ও শিরার কার্যাবলিতে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ পদ্ধতি দেখে সেই অমুসলিম বিজ্ঞানী অভিভূত ও প্রভাবিত হলেন এবং যার ফলে তিনি ইসলাম তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ১৪০০ বছর পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব নামাযের পূর্বে পবিত্রতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন, তিনি নবী ছাড়া আর কেউ নন।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ওযু

রোগ জীবাণু থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ওযুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ আলমগীর খাঁ লিখেন ঃ

'ওযু স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলনীতির একটি। এটি জীবাণুর বিরুদ্ধে এক অতি বড় ঢাল। যে সব জীবাণুর কারণে বহু রোগ জন্ম লাভ করে থাকে– এসকল জীবাণু আমাদেরকে চুতর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, বায়ু, মাটি এবং আমাদের ব্যবহৃত সব জিনিসের ওপর এ ক্ষতিকারক জীবাণু প্রভাব বিস্তার করে আছে। মানবদেহ একটি দুর্গের ন্যায়। ছিদ্র পথ অথবা জখমের স্থান ছাড়া এর মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না। নাক মুখের ছিদ্রগুলো সর্বদা জীবাণুর আক্রমণের মধ্যে আছে এবং আমাদের হাতগুলো এসব জীবাণুকে ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। ওযুর মাধ্যমে আমরা শুধু এসব ছিদ্রের মধ্যেই নয় বরং আমাদের দেহের ঐ সব অংশে দিনে কয়েকবার ধৌত করি যা কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং সহজে জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এজন্য ওযু আমাদেরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করার এক উত্তম উপায়'।

ওযু ও মানবদেহ

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী যিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়ে 'চিকিৎসা ও আঘাত' বিভাগের প্রধান এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনীয়াত-এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন ওযুর দৈহিক উপকারিতার বিষয়ে লিখেছেন :

'ওযুর দ্বারা মানুষের ঐসব অঙ্গ যা খোলা থাকে যেমন - হাত, মুখ, নাক, চোখ, চেহারা ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব অঙ্গগুলো সব সময় খোলা থাকায় এবং এগুলো দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধ ও নোংরা জিনিসের সাথে মিশে থাকে এবং বেশিরভাগ সক্রিয় রোগ সৃষ্টি কারণ হয়। ওযুর মাধ্যমে এ সব আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে থাকে। ওযুর আরও উপকারিতা এই যে, ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে যে অবসাদগ্রস্ততা, ক্লান্তি মানব প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় তা ওযুর পরে দূর হয়ে যায়। মানুষের মন-মগজে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এজন্য যে ওযু শিরার কেন্দ্রগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে।' (ইসলামের স্বাস্থ্যগত মূলনীতি, পৃ.-৩১ ডা. সাইয়েদ হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী, প্রকাশক হাইয়া আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

ওযুর উপকারিতা

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী, 'ওযু স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম'-শীর্ষক আলোচনায় ওযুর চিকিৎসাগত উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি (Blood circulatory system) এর ওপর ওযুর প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর লিমফথিক সিসটেম Lymphatic System - এর ওপর ওযুর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন যা নানা প্রকারের রোগ ব্যাধি থেকে সুরক্ষার নিয়ম। সর্বশেষে ওযু এবং শারীরিক বৈদ্যুতিক স্থিতি (A static electricity of the body) এর ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করেছেন।

ডাক্তার নূর বাকী- এর দৃষ্টিতে যে পদ্ধতিতে ওযু করা হয় এর উদ্দেশ্য দেহের মধ্যকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর কয়েকটি দিক হলো -

১. দেহকে সংরক্ষণের জন্য লিমফথিক ব্যবস্থা (Lymphatic System) সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা দরকার। ওযু এ কাজের দায়িত্ব বহন করে।
২. দেহের মধ্যকার সংরক্ষণের স্থান যা নাকের পিছনে নাসারন্ধ্র, এ সকল স্থান ধৌত করা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।
৩. ঘাড়ের দুপাশে ওযুর দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করার লিমফথিক পদ্ধতি (Lymphatic System) এর 'ক্রয়ে কার্লানের' মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ওযুতে পানি ব্যবহার

খ্যাতনামা একজন জার্মান গুণী ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের শিক্ষার ওপর চিন্তা ভাবনা করার পরে এ সত্যকে স্বীকার করে তিনি লিখেন–

গোসল দ্বারা সারা দেহ এবং ওযুর দ্বারা এর অঙ্গগুলো পাক করা জরুরি যা সাধারণ কাজকর্ম অথবা চলা ফেরার মধ্যে খোলা থাকে। মুখ পরিষ্কার করা, মিসওয়াক করা, নাকের ভেতরের ময়লা-আবর্জনা দূর করা এ সকলই স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ আবশ্যকগুলোর বড় শর্ত হলো পানি প্রবাহের ব্যবহার, যা বাস্তবে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা করে।

ওযু ও গোসল

ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওযুকে আবশ্যক বা ফরয করা হয়েছে। শারীরিক পবিত্রতার ওপর অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এরূপভাবে মিলনের পরে স্বামী-স্ত্রীর গোসল করা এবং হায়েজ-নেফাসের পর মহিলাদের গোসল করা অত্যাবশ্যক। এর কারণ এই যে, বীর্যের বস্তুগুলো এবং হায়েজ-নেফাসের দুর্গন্ধময় রক্ত জীবাণুর বাহন। এজন্য আবশ্যক এ নাপাকিগুলো দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যাতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিস দেহকে কোনো রোগাক্রান্ত না করতে পারে। এছাড়াও শরীরকে পানি দ্বারা ধৌত করায় তার সুপ্রভাব আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

যদি এশার সালাত আদায় করার পরে মানুষ ঘরোয়া কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় অথবা এভাবে অলস বসে থাকে এবং তার ওযু চলে যায় তাহলে উত্তম হলো সে ওযু করে শোবে। ওযু করে শোয়াতে পূর্ণ প্রশান্তি এবং গাঢ় ঘুম আসবে এবং শরীরও পূর্ণভাবে জীবাণু থেকে পবিত্র হবে।

যদি হাতগুলোতে জীবাণু থাকে তাহলে ঘুমের মধ্যে তা সহজে মুখ; নাকের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। এছাড়াও যদি খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে পড়ে তাহলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু এবং যাবতীয় পোকা আঙ্গুলের ফাঁক এবং খাবার কণার ওপর আক্রমণ করে থাকে। এজন্য নবী করীম (স) ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি রাতে এ অবস্থায় শোয় যে, তার হাতে খাদ্যের কণা ছিল, এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হলে সে নিজেকে যেন খারাপ বলে তার অলসতার কারণে এরূপ হয়েছে।'

Contents

রাসূল করীম (স) শোয়ার পূর্বে নিয়মমাফিক ওযু করতেন। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, 'যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা কর, তখন ওযু কর, যেভাবে নামাযের জন্য ওযু করা হয়।'

(সহীহ বুখারী)

হাদিসের গুরুত্ব দিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার ইমতিয়াজ লিখেছেন, শোয়ার পূর্বে হাত, মুখ এবং অন্যান্য অংশ ধোয়া আবশ্যক। কেননা, দিনভর মাটি, ময়লা, ধুলা ও জীবাণুগুলো ছিদ্রে জমা হয়ে চামড়াকে দূষিত করে থাকে। মুখ ধোয়ার দ্বারা চোখের মধ্যে জমা হওয়া ধুলাবালিও পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাসূল করীম (স) দৈহিক পবিত্রতার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক আছে যে, সে সপ্তাহে অন্তত এক দিন গোসল করবে এবং নিজের মাথা ও দেহকে ধৌত করবে।'

নবী করীম (স) এরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে কোনো খানাপিনার জিনিসে হাত লাগানোর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার নিজেদের হাত ধোবে।'

সব সময় দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিষ্কার কাপড় পরা এবং গোসল করা- এগুলো পরিচ্ছন্নতার অংশ। এর ফলে দেহের ওপর থাকা সব জীবাণু পরিষ্কার হয়ে যায়। যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে তাদের দেহে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগের সৃষ্টি করে এবং তা দেহের বাকি অঙ্গগুলো যেমন- হাড়, পিঠ এবং জোড়া ইত্যাদির ওপর প্রভাব ফেলে। এ সব রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হলো বার বার গোসল করতে হবে এবং দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে চর্মের ওপরে থাকা জীবাণু ধুয়ে যায় এবং মানুষের চর্ম ও দেহ এ জীবাণুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষ ও নারীদের ওপর কয়েক অবস্থায় গোসল ফরয। কোন্ কোন্ কারণে গোসল ফরয হয়-এর বর্ণনা ফিকহর কিতাবগুলো যেমন- বাহারে শরিআত, কানুনে শরিআত, নুরুল ইজাহ, কুদুরী, আসান ফিকাহ, কানযুদ দাকায়িক হেদায়া, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে। জানাবাতের অবস্থায় গোসল করার মধ্যেও অনেক কৌশল ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান সাক্ষী দেয় যে, জানাবাতের অবস্থায় ঘামও ঘন হয়ে যায় এবং ঘামের সাথে মিশে যে ময়লা দেহের ওপর জমে যায়, তাকে যদি ঘষে ঘষে পরিষ্কার না করা হয় তা হলে তা খোস-পাঁচড়ার কারণ হয়। নিয়মিত গোসলকারী

এরূপ চর্মরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। রোগের প্রতিরোধ ছাড়াও গোসলের দ্বারা শরীরে সতেজতা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। খারাপ চিন্তা-ভাবনা থেকে মনমগজ মুক্তি পায় এবং অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি এবং ফরয আদায় করার জন্য মনের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এত দেহ মন সুস্থ ও সবল থাকে।

খ্যাতনামা জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ লিখেন ঃ গোসল ও ওযুর কর্তব্যগুলো একান্তই কল্যাণ ও উপকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সালিহুল আকলিয়াহ লিআহকামিন্ নাকলিয়াহ)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নামায ফরয করেছেন এবং এর জন্য ওযুকেও ফরয করেছেন। ওযু ব্যতীত নামাযই হয় না। বারবার মুখ, হাত ও পা ধোয়ার দ্বারা, কুলি করার দ্বারা, নাকে পানি দেয়ায় সকল অংশের ওপর থাকা জীবাণু চলে যায়, এভাবে নামাযী বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। তবে উল্লেখিত গবেষণার কারণে কেউ এ কথা বলে না যে, ওযু ও গোসলের মানবিক উদ্দেশ্য দেহকে সুরক্ষিত করে না। তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী তার রচিত 'ওযু সুন্দর স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র'-তে একথা প্রকাশ করেছেন যে,'তাঁর দৃষ্টিতে চেহারার সৌন্দর্য রক্ষা এবং চর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ওযু একটি ঢাল। তাঁর মতে 'প্রশান্তির বিদ্যুতের (Electricity of Tranquillizer) সবচে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব চামড়ার নিচে। এ করণে যে, এটা চেহারা থেকে শুরু হয়। এ আমল সারা দেহের ওপরও প্রভাব ফেলে থাকে। অনেক লোক এ সব লোকদের উজ্জ্বল চেহারার গোপন রহস্য জানার পর নিজের জীবনে ওযু করার অভ্যাস গড়েছেন। যে কেউ ওযুর অভ্যাস রাখে সে নিশ্চিতই স্বাস্থ্যবান। অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী ত্বক বা চামড়া বর্তমান সময়ে এক মুজিযা যে, যেভাবে সৌন্দর্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এর দশগুণ অধিক খরচের দ্বারাও ওযুর মুকাবিলা করা সম্ভব নয় ওযুর বরকতই আলাদা।

লন্ডন ইউনিভার্সিটি এম. ফার্মেসী মুহাম্মদ ফারুক কামাল মানুষের অঙ্গের ওপর ওযুর প্রভাব উল্লেখ করে লিখেন ঃ মানুষ মুখ ধোয় তার দ্বারা চোখ ধৌত হয়, নাক পরিষ্কার হয়, চেহারার চর্ম ধৌত হয়। যার কারণে চর্মের ওপর এক তেজোদীপ্ততা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং চর্মের প্রদাহ থেকে মানুষ রক্ষা পায়। কনুই পর্যন্ত হাত ও পা সুন্দরভাবে ধোয়ার দ্বারা মানুষ চর্মরোগের থেকে রক্ষা পায় এবং এ কাজ দ্বারা যেখানে যেখানে পানি পৌঁছায় সেসব স্থানে রক্ত পরিসঞ্চালন বেড়ে যায়। ময়লা আবর্জনা বের হওয়ায় চামড়ার রঙে ঔজ্জ্বল্য এবং বিশেষ চমক সৃষ্টি হয়। সকল নামাযের সঙ্গে মিসওয়াকেরও হুকুম আছে। এরও বহু প্রকারের উপকারিতা রয়েছে,

যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মাথা ও ঘাড় মাসেহ দ্বারা মানুষের হালকা পাতলা লেগে থাকা ময়লা ও ধুলাবালি দূর হয়। এ দ্বারা চুলের সৌন্দর্য বজায় থাকে। ওযুর দৈহিক উপকারিতার সাথে সাথে আত্মিকভাবেও মানুষ অনেক প্রশান্তি অনুভব করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, স্মরণ শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ওযুর মধ্যে দেহের ঐ সকল অংশ ধোয়াকে আবশ্যক করা হয়েছে যা খোলা থাকে এবং ঐগুলোই জীবাণু প্রবেশের প্রধান প্রধান পথ।

ডাক্তার শাহেদ আতহার (ক্লিনিক্যাল এসোসিয়েট প্রফেসর অব ইন্টারন্যাল মেডিসিন ইন্ডাইন্ড কৃনিলজী, ইউনিভার্সিটি আইডিয়াল স্কুল অব মেডিসিন) ওযুর ডাক্তারি উপকারিতা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ Washing all the exposed areas of the body, hand, feet, face, mouth, etc 5 times a day is a health preventive procedure." (Health guidelines from Quran and Sunnah. P.—60)

বাদশাহ আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দায় মেডিকেল কলেজ-এর সাথে যুক্ত ডাক্তার হাসান গজনবী (Islam and medicine নামে) তাঁর এক প্রবন্ধে ওযু সম্পর্কে বলেন ঃ "A pre-requisite of prayers yet one of the most hygienic procedure as it usualy keeps the exposed parts of our body clean and also the parts of entry like mouth and nose thus avoiding infection."

অর্থাৎ নামাযের পূর্বশর্ত অন্যতম সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি ওযু যা সাধারণত দেহের খোলা অংশগুলো পরিপূর্ণ রাখে এবং জীবাণু প্রবেশের পথগুলো যেমন– মুখ, নাক, প্রভৃতি ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে।

ওযুর ফযিলত

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত– আমি নবী করীম (স) থেকে একথা বলতে শুনেছি যে, "মুমিনের অলংকার কিয়ামতের দিন ঐ পর্যন্ত পৌছাবে, যে পর্যন্ত ওযুর পানি পৌছায়।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেন ঃ অবশ্যই আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় ডাকা হবে যে, তাদের ওযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে। এজন্য যে ব্যক্তি নিজ ঔজ্জ্বল্যকে বাড়াতে চায়, সে যেন তা বাড়ায়।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করল এবং সুন্দরভাবে করল, তার গুনাহ দেহ থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি ওযুকারীর গুনাহগুলো তার নখের নিচ থেকে বের হয়ে যেতে থাকে।

আমীরুল মুমিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়্যেদুনা হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর (স) এরশাদ করেন ঃ যে কেউ পূর্ণ ওযু করে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেনঃ যে ওযু করার সময় সকল অঙ্গ একবার ধৌত করে, এটা ফরজের মর্যাদা পায়, এ ছাড়া ওযুই হয় না। আর যে ব্যক্তি ওযুর মধ্যে সকল অঙ্গ দুবার ধৌত করে তার দ্বিগুণ প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি ওযুর মধ্যে অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধৌত করে তবে এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওযু। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের ইচ্ছায় ওযু করার জন্য ওঠে, অতঃপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে, তাহলে তার হাতের গুনাহ প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়, অতঃপর যখন কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে, তাহলে তার জিহ্বা এবং গিরাগুলোর গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন চেহারা ধৌত করে, তখন স্বীয় গুনাহগুলো থেকে এরূপভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন আজই তার মাতা তাঁকে জন্ম দিলেন। অতঃপর যখন নামায পড়ার জন্য খাড়া হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এ নামাযের কারণে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। যদি (শুধু) বসেও থাকে, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে বসে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত খলিফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, অতঃপর اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়, তাতে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করার পর বলে, ওহে প্রভু! পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমারই নিকট ফিরে আসি। তাহলে এ দুআগুলো এক কাগজে লিখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত ছিঁড়বে না (বরং এর উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হবে।)

(ওয়াকিফাতুজ জাহাবী)

ওযুর ত্বরীকা

মহান আল্লাহ্ তাআলা ওযুর বিষয় উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

অর্থ ঃ হে ঈমানদানগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কণুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং মাসেহ কর তোমাদের মাথা (অংশ বিশেষ) এবং ধৌত কর তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত।"

ওযুর ফরয

ওযুর ফরয চারটি, যা উল্লিখিত পবিত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ফরয ঃ মুখমণ্ডল, অর্থাৎ কপাল থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত এ পরিমাণ ধোয়া যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে।

দ্বিতীয় ফরয ঃ বাহুদ্বয় কনুই পর্যন্ত এভাবে ধোয়া যাতে কোনো স্থান শুষ্ক না থাকে।

তৃতীয় ফরয ঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা,

চতুর্থ ফরয ঃ টাখনুসহ পা ধোয়া যেন কোনো স্থান পানি প্রবাহ থেকে খালি না থাকে।

ওযুর সময় এই চার ফরযের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় ওযু শুদ্ধ হবে না।

ওযুর সুন্নাত

১. ওযুর নিয়ত করা।
২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।
৩. মিসওয়াক করা।
৪. তিনবার হাতগুলোকে কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৫. তিনবার কুলি করা এবং দাঁতের ওপর আঙ্গুল মিলানো।
৬. তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।
৭. তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া
৮. তিনবার কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।

৯. প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করা।
১০. পুরো মাথা মাসেহ করা।
১১. কান মাসেহ করা।
১২. ঘাড় মাসেহ করা (মুস্তাহাব)
১৩. দু'পা তিনবার করে ধোয়া।
১৪. প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা দোয়া।
১৫. দাড়ি খিলাল করা।
১৬. হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।
১৭. অঙ্গগুলোকে ডলে ডলে গুরুত্বসহ ধোয়া।
১৮. ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে ধৌত করা।

রাসূল (স) এর ওযু

ইসলামী খিলাফতের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গনী (রা) ওযুর পানি আনতে বললেন, এরপর ওযু করতে শুরু করলেন, প্রথমে তিন তিন বার নিজ হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন, এরপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন, তারপর তিনবার নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, অতপর তিনবার কনুইসহ ডান ও বাম হাত ধুয়ে ফেললেন এবং টার মাথা মাসেহ করলেন, এরপর তিনবার টাখনুসহ ডান পা ধৌত করলেন, এরপর তাখনুসহ তিনবার বাম পা ধৌত করলেন, এরপর উসমান গনী (রা) ইরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) -কে এরূপ ওযু করতে দেখেছি ঃ (মুসলিম, সালাতের গুণাবলি অধ্যায় খ-১, আরবি-১২০)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ওযু

চিকিৎসাশাস্ত্রে স্বীকৃত ওযুর অনেক বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

হাত ধোয়া

নবী করীম (স)-এর সুন্নত অনুযায়ী দুহাত তিনবার ধোয়া হতেই ওযু শুরু। হাদীস শরীফে এই পদ্ধতিকে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ .

অর্থ ঃ যখন উভয় হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচে দিয়েও পড়তে থাকে। (সুনানে নাসায়ী)

হাত ধোয়ার মাধ্যমে মানবদেহের উপকার সাধিত হয়

প্রতিমুহূর্তে আমরা বিভিন্ন বস্তু হাত দিয়ে ধরে থাকি। সবসময় খোলা থাকে বলে হাতের উপর বিভিন্ন রোগের জীবাণু বা বিভিন্ন কেমিক্যাল রাসায়নিক পদার্থ জমে থাকে যা আমাদের হাতকে কলুষিত করে। যদি হাত না ধুয়ে কুলি করা হয় বা নাকে পানি দেয়া হয় তাহলে এ সব জীবাণু সহজেই আমাদের মুখ বা নাকের সাহায্যে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। হাত ধোয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে না। এসম্পর্কে আমেরিকার অধ্যাপক ডাক্তার শাহেদ আতহার এম ডি লিখেছেন–

Hand washing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However Non-Muslim did not know that hand washing is so important has been ordred in the Quran 1400 years ago". (Health Guidelines from Quran and Sunnah. P. 60)

'বর্তমানে হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। অমুসলিমগণ জানেন না যে, হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আল কুরআনে সেই ১৪০০ বছর পূর্বে।'

গবেষক ও চিন্তাবিদ খাজা শামসুদ্দিন আজিমী লিখেছেন, 'যখন আমরা ওযু করি তখন আঙ্গুলের ফাঁকগুলো থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন বৃত্ত তৈরি করে যে, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূরীকরণের বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলার শক্তি বেড়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক সীমা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঝলক দেয়। এ কাজের দ্বারা হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সঠিক পদ্ধতিতে ওযু করার দ্বারা আঙ্গুলের মধ্যে এমন লাবণ্য তৈরি হয়, যার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাজ বা সিস্টেমের ওপর পরিবর্তন করার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়।'

কুলি করা

ওযু করার সময় তিনবার কুলি করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে গুনাহ ধুয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه .

অর্থ ঃ যখন মু'মিন বান্দা ওযু করার সময় কুলি করে, তখন তার মুখের সকল গুনাহ ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

কুলির মাধ্যমে দাঁতের মাঝখানে ঢুকে থাকা খাদ্যকণা মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যদি দাঁতের ফাঁক থেকে এ সব কণা বের না করা যায় তাহলে এগুলো দাঁত, মস্তিষ্ক এবং গলায় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। কুলি করায় মুখ পরিষ্কার হয়, দাঁত রোগ থেকে মুক্ত থাকে, চোয়াল মজবুত হয় এবং দাঁত হয় উজ্জ্বল, রুচি বেড়ে যায় এবং মানুষ টনসিলের রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

নাকে পানি দেয়া

নাকে পানি দেয়াও ওযুর সুন্নত। এক্ষেত্রে ডান হাতের মাধ্যমে নাকে তিনবার পানি দিয়ে এবং বাম হাতের মাধ্যমে নাক পরিষ্কার করা হয়। এভাবে হাদীস শরীফে নাক পরিষ্কার করারও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "ওযু করার সময় মুমিন যখন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, তখন নাকের গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়।" (মুসনাদে আহমদ)

সুনানে নাসায়ী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন– فَإِذَا اسْتَنْشَقَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ .

অর্থ ঃ মুমিন বান্দা ওযু করার সময় যখন নাক ধোয়, তখন নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। (সুনানে নাসায়ী)

নাক ধোয়া এবং পরিষ্কার করার মধ্যে পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি চিকিৎসাগত উপকারিতাও অর্জিত হয়। কুলি করার পর নাকে পানি দেয়া হয়। নাক মানব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ দেয়ার যোগ্য অঙ্গ। নাকের অন্যতম কাজ হচ্ছে আওয়াজকে স্পষ্ট করা এবং সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করা। নাকের মধ্যকার পর্দাগুলো আওয়াজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মস্তকের জ্যোতি একত্রিত করে। বিশেষ অংশগুলো পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাকের বড় ভূমিকা রয়েছে। নাক ফুসফুসের জন্য বায়ুকে পরিষ্কার, গরম এবং উপযুক্ত করে।

প্রতিদিন একজন ব্যক্তির নাকের মধ্যদিয়ে প্রায় শত ঘনফুট বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুর এত বড় পরিমাণে একটি বড় কক্ষ ভরে যেতে পারে। বরফের মওসুমে জমা এবং শুষ্ক দিনে বরফের ময়দানে স্কেটিং শুরু করে দিন; কিন্তু আপনার ফুসফুস শুষ্ক হাওয়ার দ্বারা সমস্যায় পড়বে না। সে এর এক অযুতাংশও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ অবস্থায় তার এত বায়ুর প্রয়োজন হয় যা গরম ও আর্দ্র হাওয়ায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সে ৮০% আর্দ্র এবং ৯০° ফারেনহাইট উষ্ণ বায়ু চায়। ফুসফুস জীবাণু থেকে পবিত্র ধোয়া অর্থাৎ ধুলা ও ময়লামুক্ত বায়ু চায়। এরূপ পরিমাণ বায়ু

জমাকৃত একটি এয়ারকন্ডিশন ছোট ট্যাংকের সমান হবে অথচ নাকের মধ্যে কুদরতী নিয়ম একে এমন সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত করে দিয়েছে যে সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা। নাক বায়ুকে আর্দ্র করার জন্য $\frac{1}{8}$ গ্যালন (এক চতুর্থাংশ গ্যালন) আর্দ্রতা প্রতিদিন তৈরি করে থাকে। পরিষ্কার এবং অন্যান্য শক্ত কাজ নাসারন্ধ্রের চুলগুলো করে থাকে। নাকের মধ্যে এক খাদক ঝাড়ু আছে। এ ঝাড়ুর মধ্যে অদৃশ্য শলাকা রয়েছে যা হাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌছানো ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবাণুগুলো মেশিনের মতো ধরা ছাড়াও অদৃশ্য শলাগুলোতে জীবাণু প্রতিরোধী মাধ্যম রয়েছে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাক চোখগুলোকে রোগ সংক্রমণ (Infection) থেকে রক্ষা করে।

কোনো নামাযী যখন ওযু করার সময় নাকের ভেতর পানি দেয় তখন পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক রশ্মি অদৃশ্য লোম-এর কার্যকরী শক্তি বাড়ায়। যার ফলে মানুষ অসংখ্য অদৃশ্য রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

মুখমণ্ডল ধোয়া

ওযু করার সময় মুখমণ্ডল একবার ধোয়া ফরয এবং তিনবার ধোয়া নবী করীম (স)-এর সুন্নাত। মুখমণ্ডল হচ্ছে মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। হাদীস শরীফে চেহারা ধৌত করা রহমতের কারণ। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন—

فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ .

অর্থ : ওযুকারী যখন নিজ চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার গুনাহগুলো ঝরে যায় এমনকি চোখের পালকের শিকড় থেকেও বের হয়ে যায়।

হুজুর (স) আরো বর্ণনা করেন, ওযুকারী যখন নিজ মুখমণ্ডল ধোয়, তখন সকল গুনাহ এবং অপরাধ এমনভাবে পাক হয়ে যায়, যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করল। (মুসনাদে আহমদ)

মুখমণ্ডল ধোয়ার উপকারিতা

মুখমণ্ডল ধোয়ার মধ্যে অপরিমেয় কল্যাণ রয়েছে। এর দ্বারা অবয়বে নম্রতা সৃষ্টি হয়। ধূলা-বালিতে বন্ধ লোমকূপ খুলে যায়। চেহারা উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়। মুখ ধোয়ার সময় পানি যখন চোখের মণিতে পৌছায় তখন চোখ শীতলতা অনুভব করে এবং এটি সতেজ হয়। গোলকের সাদা এবং মণির মধ্যে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়।

ওযুকারীর চোখ আকর্ষণীয় সুশ্রী ও কোমল হয়। চেহারার ওপর তিনবার হাত বুলানোতে সীনা ও মস্তিষ্কে প্রশান্তি আসে।

সাধারণত আমরা যখন ঘর থেকে বের হই তখন আমাদের চলাচলের স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ব্যাপক পরিমাণে জীবাণু যেমন অনেক স্থানেই ময়লা আবর্জনার বর্জ্য স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যায় অথবা তখন প্রাণী বা মানুষের বর্জ্য খোলা, কোথাও বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ যেমন নাড়ী-ভুড়ি, রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। আর রাস্তার পাশের ডাস্টবিনতো জীবাণুর স্বর্গরাজ্য এবং যখন এটা খোলা পড়ে থাকে তখন এই জীবাণু পরিবেশের সাথে মিশে যায়। তাই এ সব স্থান অতিক্রম করার সময় সকল প্রকারের জীবাণু মানুষের হাত, চেহারার ওপর আক্রমণ করে এবং আমরা যখন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ বার আমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করি তখন এ সব জীবাণু থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

ময়লা-আবর্জনা আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। শিল্পের উন্নতি আমাদেরকে গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে। কারখানার চিমনি থেকে বের হওয়া গ্যাস এবং গাড়ির সাইলেন্সার থেকে নির্গত ধোয়া দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। এ আবহাওয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড ছাড়া সালফার-ডাই-অক্সাইড মিশে যাচ্ছে। বাতাসের মধ্যে যদি এ সব গ্যাস বেশি বেশি থাকে এবং একজন মানুষের ঘামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে চেহারার ওপর থাকা ঘামের ফোঁটা এই গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস কার্বন এসিড, সালফিউরিক এসিড প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই ঘাম থেকে সৃষ্ট এসিড মানব চর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য মুখমণ্ডল ধোয়ার সাথে সাথে ঘাম এবং বিষাক্ত কেমিক্যাল ইত্যাদি ধুয়ে চলে যায় এবং মানুষ চর্মরোগ এবং চেহারার অ্যালার্জী থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকতে পারে।

ওযুর মাধ্যমে চেহারা ধোয়ার ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে পারে। চোখের অসুখের সময় ডাক্তারগণ বার বার চোখ ধোয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। হাকীম মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ চাগতাঈ-এর মতে ওযু করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায়, মেডিকেল সাইন্স বলছে যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে, তাহলে চোখের রোগ থেকে মানুষ বেঁচে যায়।

প্রতিদিন বারবার ওযুর মাধ্যমে মুখমণ্ডল ধোয়ার কারণে চেহারার সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি-এর সদস্য লেডি বাউচার এক আশ্চর্য ও চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার বক্তব্য হলো যে, মুসলমানদের কোনো

প্রকারের কেমিক্যাল জাতীয় লোশনের প্রয়োজন নেই, তারা ইসলামি ওযুর মাধ্যমে চেহারা ধুয়ে থাকে এবং এজন্য মুসলমানগণ বেঁচে থাকে কয়েকটি রোগ থেকে।

দাড়ি খিলাল করা

ওযু করার সময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি ধোয়া যায় এবং ঘন দাড়ি আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করে চুলগুলোকে ভিজানো হয়। এটা নবী মুস্তফা (স) এর সুন্নাত।

দাড়ি ধোয়া অথবা খিলাল করায় চুলের গোড়া ভিজে যায় এবং সেগুলো মজবুত ও পরিষ্কার থাকে। দাড়ি খিলাল করায় সব ধরনের জীবাণু (Common and Contaglius Germs) ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। দাড়ির চুলে জমে থাকা পানি গলায় শক্তি যোগায়। এভাবে থাইরয়েড গ্লান্ড গলার সকল রোগ থেকে বাঁচিয়ে থাকে।

নবী করীম (স)-এর প্রতিটি কথায় হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে। ওযু ও নামায-এর বিধানাবলি একই সাথে প্রভুর সন্তুষ্টি ও আত্মিক উন্নতি এবং কল্যাণ বয়ে আনে। পাশাপাশি মানবদেহ এবং দুনিয়ার জীবন এর কয়েকটি সমস্যা থেকে বাঁচায়। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতার নিশ্চয়তা একমাত্র এবং শুধুমাত্র ইসলামের বিধানের ওপর আমল করার ওপর নির্ভরশীল। অপর কোন ধর্ম এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আর এ কারণে অন্যান্য ধর্ম বাতিল হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা ইসলামকে স্থায়ী রাখবেন কিয়ামত পর্যন্ত।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

ওযু করার সময় কনুইসহ হাত একবার ধোয়া ফরয এবং তিনবার ধোয়া সুন্নাত। মুমিন বান্দার এ ধরনের আমলকে রহমতের কারণও বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ .

অর্থ ঃ যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে। (সুনানে নাসায়ী)

বাহুর এ অংশে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের রক্তনালী বা শিরা। দেহের এ অংশ বিভিন্ন প্রকার রোগকে চিহ্নিত করার জন্য সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে নাড়ির স্পন্দন (Pulse) এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। এ অংশগুলো ধোয়া এবং ম্যাসেজ করার মাধ্যমে মানবদেহের ওপর ধনাত্মক (ইতিবাচক) উপকারী প্রভাব পড়ে থাকে। পানি রক্তের উত্তাপকে কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure) কমিয়ে দেয়।

মাথা মাসেহ করা

এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা ফরয এবং একবার পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। মুসলমানদের এই আমলকেও গুনাহের কাফফারা অর্থাৎ কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ .

অর্থ ঃ ওযুকারী যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ ঝরতে থাকে এমনকি তার দুই কানের নিচ থেকেও। (সুনানে নাসায়ী)

মাথা মাসেহ করার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক কল্যাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞজনের মতে মাথার ওপরের চুল মানুষের এন্টেনার (Antenna) কাজ করে থাকে। এ কথা প্রতিটি অনুভূতিসম্পন্ন লোকই জানেন, মানুষের মধ্যে আছে তথ্যভাণ্ডার। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজের ব্যাপরে খবর না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না। যেমন তখনই আমরা আহার করি যখন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পেলে পানি পান করি। আমাদের শিরাগুলোর আরামের প্রয়োজন হলে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ি। যখন আমাদের মধ্যে খুশির খবর জমা হয় তখন আমাদের মন ফুরফুরে হয়। অনুরূপভাবে অসন্তুষ্টি, রাগ ইত্যাদিও খবরের ওপর নির্ভর করে পরিসঞ্চালিত হয়।

ওযু করার নিয়ত মূলত আমাদের এ কথার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে যে আমরা এ কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য করছি। ওযুর বিধান পূর্ণ করার পর যখন আমরা মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছি তখন আমাদের মনোযোগ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল শক্তি থেকে ঘুরিয়ে আল্লাহ তাআলার সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। মাসেহ করার সময় যখন আমরা মাথার ওপর হাত বুলাই তখন মাথার চুলগুলো Antenna র মতো এ কথাকে গ্রহণ করে যা সকল প্রকারের কুসংস্কার, বঞ্চনা এবং আল্লাহ তাআলার গণ্ডির বিপরীত। মস্তিষ্ক তথ্য বা সংবাদ গ্রহণ করে এবং এ তথ্যগুলো তরঙ্গের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। তথ্য বা সংবাদের প্রত্যেক তরঙ্গ একটি অস্তিত্ব রাখে, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আন্দোলিত হওয়া। নিয়ম হলো, আলো হোক কিংবা পানি– এর জন্য প্রবাহ আবশ্যক এবং প্রবাহের জন্য শর্ত হলো, তা যেমন প্রকাশ হবে এবং বিলীনও হবে। যখন কোনো মানুষ পা ধৌত করে, তখন অতিরিক্ত আলোর চাপে বিষ (Poison) আর্থিং (Earthing) হয় এবং মানবদেহ বিষাক্ত বস্তু থেকে সুরক্ষিত থাকে।

কান মাসেহ করা

কান মাসেহ করা রাসূল (স) -এর সুন্নাত। কানের ভেতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙুল দিয়ে এবং বাইরের দিকে (পিঠ) আঙুল দিয়ে মাসেহ করার মাধ্যমে কানের সব ধরনের ময়লা দূর হয়ে যায়। ফলে শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে। যখন কানগুলো মাসেহ করা হয় তখন হৃদয়ের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে।

ঘাড় মাসেহ করা

ওযুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ওযু হচ্ছে ফরয–সুন্নাত এবং মুস্তাহাব মেনে ওযু করা হয়। মুমিনের ঘাড় মাসেহ করাও ফযিলতপূর্ণ। রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ.........—

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ওযু করল এবং দু'হাত দ্বারা স্বীয় ঘাড় মাসেহ করল ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ঘাড় জিঞ্জির (শিকল) থেকে বেঁচে যাবে।

(সুনানে নাসায়ী)

ঘাড় মাসেহ করার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। ফ্রান্সের একজন নিউরো সার্জন বলেন– 'আমি যে রিসার্চ (গবেষণা) করলাম এ অনুযায়ী যদি চুল অনেক বড় হয় এবং ঘাড়কে শুষ্ক রাখা হয়, তাহলে এদের মধ্যে কয়েকবার শুষ্কতা সৃষ্টি হয় এবং মানবদেহে এর প্রভাব পড়ে থাকে। কোনো কোনো সময় এমনও ঘটে যে মানব মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ জন্য ডাক্তারগণের পরামর্শ ঘাড়কে দিনে দু' চার বার অবশ্যই ভিজাতে হবে।'

এ থেকে বোঝা যায়, ঘাড় মাসেহ করার মাধ্যমে মানুষ মস্তিষ্কের অনেক প্রকারের রোগ থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করে।

আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞগণ মানবদেহকে ছয় অংশে বিভক্ত করেছেন। এক অংশ হলো 'হাবলুল ওয়ারীদ' জীবন শিরা বা শাহরগ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .

অর্থ ঃ 'আমি তার কাছে শাহরগের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী।'

মাথা ও ঘাড়ের মাঝে অবস্থিত এ শাহরগ। ঘাড় মাসেহ করলে মানুষের দেহে এক বিশেষ প্রকারের শক্তি অর্জিত হয়। মেরুদণ্ডের ভেতরে ঝিল্লিসমূহ এবং সারা

দেহের জোড়াগুলোর সাথে এর সম্পর্ক আছে। যখন কোনো নামাযি ঘাড় মাসেহ করেন, তখন হাতের মাধ্যমে প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে শাহরগের ভেতরে জমা হয় এবং মেরুদণ্ডের হাড়কে চলাচলের মাধ্যম বানিয়ে দেহের পূর্ণ শিরার শৃঙ্খলার মধ্যে ছড়িয়ে যায়, যার মাধ্যমে শিরা শক্তি পায়।

পা ধোয়া

ওযুর সময় টাখনুসহ দু'পা একবার ধোয়া ফরয এবং তিন বার ধোয়া রাসূল আকরাম (স) -এর সুন্নাত। হাদীস শরীফে পা ধোয়াকেও গুনাহের কাফফারা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ .

অর্থ ঃ ওযুকারী যখন পা ধৌত করে, তখন পায়ের গুনাহ ঝরতে থাকে এমনকি পায়ের নখগুলোর নিচ থেকে বের হতে থাকে। (সুনানে নাসায়ি)

পা শরীরের অংশ যা চলার সময় সবচেয়ে বেশি ময়লা, ধুলা, কাদা, জীবাণু ও আবর্জনার সংস্পর্শে আসে। এ জন্য পা দুটি দিনে একাধিকবার ধোয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার ডায়াবেটিকস রোগীদের জন্য পা-এর হিফাযত খুবই জরুরি কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে বেশি ইনফেকশন হয়ে থাকে।

সালাতের উপকারিতা

সালাতে রয়েছে শিফা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আমার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, তখন রাসূল (স) আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ 'তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে? আমি বললাম, 'জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, 'দাঁড়াও এবং নামায আদায় কর। কেননা নামাযের মধ্যে শিফা (আরোগ্য) রয়েছে।' (সুনানে ইবনে মাজা, চিকিৎসা অধ্যায়)

নবী করীম (স) এর বাণী এই সত্যকে প্রকাশ করে যে নামায কায়েম করা শারীরিক রোগের জন্যও আরোগ্য বিশেষ। তবে শর্ত এই যে, আন্তরিকতার সাথে নবী করীম (স) এর সুন্নাত অনুযায়ী নামায আদায় করতে হবে।

ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের দৃষ্টিতে, নামায থেকে যতটা আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশান্তি লাভ হয়, এর মধ্যে ঠিক ততটাই দৈহিক স্বাস্থ্যের সুফল মওজুদ

আছে। নামাযের আরকান যদি উত্তমভাবে এবং নিয়ম মতো আদায় করা যায়, তাহলে এর বরকতে কয়েক প্রকারের শারীরিক রোগ থেকেও মুক্তি অর্জন সম্ভব।

সালাতের প্রভাব

সালাত দৈহিক এবং মানসিক রক্ষা ও হিফাযতের ব্যাপারে বিস্ময়কর প্রভাব রাখে এবং দেহ-মনের ক্ষতিকর বস্তু থেকে মানুষ নিজেকে হিফাযত করতে পারে। দুনিয়াতে যত লোক কোনো না কোনো বালা-মুসিবতের শিকার হয়, এর সঙ্গে সালাত আদায়কারীর সংশ্লিষ্টতা কম থাকে। সর্বদিক দিয়ে সালাত আদায়কারী মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

সালাত বড় অনুগ্রহ

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে বড়ই ইহসান বা অনুগ্রহ করেছেন। কারণ নামায আমাদের আত্মিক উন্নতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি দান করে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে পবিত্রতার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করায়। অনুরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও নামায সাহায্যকারী বটে। শরীরকে সুস্থ রাখতে, শিরা উপশিরার যন্ত্রণা ও গিটেবাত থেকে স্বস্তি পেতে এবং খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে নামায অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য নামাযের একটি উপকারিতা এও যে, এটি আমাদের রক্তের কলেস্টরেল অর্থাৎ চর্বিকে কমানোর ক্ষেত্রে একটা সীমা পর্যন্ত কাজ করে।

সালাত ও দৈহিক উন্নতি

ডাক্তার ও হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচ.ডি) প্রধান চিকিৎসক, আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়) তাঁর লেখা 'ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি'-তে লিখেছেন, মানুষ যদি নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য ব্যায়ামও সংযম হিসেবে গণ্য হবে। যার দ্বারা মানুষের সকল অঙ্গের বৃদ্ধি উত্তম হবে এবং তার শক্তি বাড়বে। এছাড়াও জোড়াগুলোর সচলতা থাকবে, জোড়াগুলো তাদের কাজ সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে এবং জোড়াগুলো বিভিন্ন প্রকারের রোগ থেকে রক্ষা পাবে। এ ছাড়াও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ম, রক্ত পরিসঞ্চালন এবং পঁচনপ্রক্রিয়ার ওপর উত্তম প্রভাব বিস্তার করে এবং এভাবে মানুষ জীবনভর বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আর মানুষ পার্থিব দায়-দায়িত্ব সঠিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পালন করতে সক্ষম হবে।' (ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি, ডাক্তার হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

সালাত ও ব্যায়াম

নামায একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম। এটি মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বিস্তার ঘটাতে দেয় না। অন্য সব ধর্মের মধ্যে এমন সমন্বিত ইবাদাত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়ার মাধ্যমে সবল হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের অঙ্গগুলোতে দৃশ্যমান হয় এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয়। এতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬ পূর্বোক্ত)।

সালাতের তাৎপর্য

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী-এর ধারণা এই যে, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নামাযের তাৎপর্য পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি লিখেন–

No science has power to unrave or oultne the mysteries of prayer. In particular, to view prayer merely as a physical exercise is as ridcoulous as believing that there is nothing more to the universe than the air we breathe.

অর্থ ঃ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের তাৎপর্য উপলব্ধি বা উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, পৃথিবীতে আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, পাশাপাশি দৈহিক উপকারিতার কথাও বলেছেন। তিনি লিখেন–

It today even materialists acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.

অর্থ ঃ আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, গিটের ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।

রোগের ব্যবস্থাপত্র

নামাযের ব্যায়াম কেবল বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যমই নয়, এটা ভেতরের অঙ্গগুলো যেমন– হৃদয়, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং দেহের সকল গ্লান্ড (Glands) সুদৃঢ় করে, উন্নত করে এবং দেহের সৌন্দর্য রক্ষা করে।

Contents

এমন কিছু রোগ আছে। নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে যেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ নামায আদায়ের মাধ্যমে দেহে এ সব রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ডাক্তার হাসান গজনবী লিখেন ঃ

In addition to saving us from the sins and elevating us to the heights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. They keep our body active, help digestion and save us from nuscase and joint diseases through regular balanced exercise. They help the circulation of blood and also nitrate the bad effect of cholesterol. Prayers a vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyses, diabetes mellitus etc.. Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission their doctor to leave bad. (Islamic Medicine.. p._68)

অর্থ ঃ আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর সাথে নামায আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় ধরনের সাহায্য করে। এটি আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখে, হজমে সাহায্য করে, আমাদেরকে জড়তা ও জোড়ার রোগ থেকে নিয়মিত সুষম ব্যায়ামের দ্বারা রক্ষা করে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালনে এবং কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সালাত হার্ট অ্যাটাক, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত, যেমনিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন। (পূর্বোক্ত)

পশ্চিমাবিশ্বের মানুষ আজ বিচিত্র রকমের ব্যায়াম করছে যেন তাদের দেহের কলেস্টেরল গড়মাত্রা সীমাতিক্রম না করে। তাঁরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে যে, ইসলামি নামায যা কোনোরূপ ব্যায়াম না হলেও তা নানারূপ ব্যায়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রক্রিয়াটি স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। যেমন জার্মানির প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েফ'-এ খ্যাতনামা জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডি জুলফ যুক্তির মাধ্যমে এ সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, যদি ইউরোপে ইসলামি নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়াম ও নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না। (আল মাসালিহুল আক্বালিয়াহ লিল আহকামিশ শারইয়্যাহ পৃ. - ৪০৬)

চিকিৎসাবিজ্ঞানে সালাত

ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন পাকিস্তানী চিকিৎসক মাজেদ জামান উসমানী। যখন শিক্ষক তাকে নামাযের ব্যায়াম সম্পর্কে পড়ালেন এবং বুঝালেন, তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। আর তিনি অনুধাবন করলেন এতদিন পর্যন্ত আমরা নামাযকে শুধু ধর্মীয় কর্তব্য বলেই জানতাম এবং পড়তে থাকতাম, অথচ এখানে আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয়ে গেলো যে, নামাযের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে যে সকল রোগ নিরাময় হয়– শিক্ষক তাকে এমন একটি তালিকা প্রদান করলেন। রোগগুলো হলো–

১. মানসিক রোগ (Mental Diseases)

২. স্নায়ুবিক রোগ (Nerve Diseases)

৩. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)

৪. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ (Restlessness, Depression and Anxiety)

৫. হৃদ রোগ (Heart Diseases)

৬. সন্ধিপ্রদাহ (Arthritis)

৭. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to Uric Acid)

৮. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

৯. ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)

১০. চোখ এবং নাক-কান, গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E. N. T Diseases)।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি চিকিৎসা

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন– গুনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। একই সঙ্গে নামাযের মাধ্যমে পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়া দৈহিক ও মানসিক উপকারিতাও অর্জিত হয়। আজ ইসলামি ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে, নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক হিসেবে কাজ করছে।

ব্যায়াম ও নামায

এককভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের মধ্যেই বিশেষ অঙ্গ ও জোড়ায় আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ অঙ্গগুলোর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়। শারীরতত্ত্ব (Physiolgy) এর একটি মূলনীতি এই যে, মানুষ নড়াচড়া করলে তার মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে একটি আলোড়ন স্নায়ুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো স্থানভেদে স্ফীত ও সংকুচিত হয়ে উদ্দিষ্ট কাজ করে থাকে। যখন নামায আদায়ের সময়ে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন এ কাজটি ব্যায়ামের মতোই অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন, উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি করে। এভাবে নামাযের সব রুকন আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষের অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়; যার দ্বারা মানবদেহের কার্যাবলি স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে এবং দেহের সতেজতা ও শক্তি বহাল থাকে।

সালাত সামগ্রিক ইবাদত

নামায একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম, যা মানুষকে সবসময় সতেজ রাখে। শরীরকে আলস্যভাব ও অবসাদগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করে। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যা আদায়ের মাধ্যমে মানুষের অঙ্গের নড়াচড়ার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযের মধ্যেই রয়েছে যে এটা ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়াম; যার প্রভাব মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গের ওপর সমভাবে পড়ে এবং দেহের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয়। ফলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামি স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. - ৩৬ কামালুদ্দীন হামদানী)

বস্তু সচল করা

নামায আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্য ব্যায়াম বিশেষ। নামাযের মধ্যে কিয়াম, বসা, রুকু, সিজদা এরূপ বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়া হয়ে থাকে এবং নামাযী এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হন। এর অবস্থান পরিবর্তনের কারণে নামাযে দেহের অধিকাংশ জোড়া নাড়াচাড়া করতে থাকে এবং এর সাথে বেশির ভাগ অদৃশ্য অঙ্গগুলো পাকস্থলী, অন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র এবং খাদ্যনালী ইত্যাদিতে নড়াচড়া হয় এবং পরিবর্তন আসে। (তিব্ব নববী, পৃ.-৩৯৯, ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ)

নামাযের স্বাস্থ্যগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

নামাযের কিছু আরকানের স্বাস্থ্যগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আছে। এ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হলো—

তাকবীরে তাহরীমা

আমরা হাতগুলোকে যখন কান পর্যন্ত উঠাই তখন আপনা আপনি বাহু, ঘাড় ও কানের ব্যায়াম হয়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম খুব উপকারী। নামায পড়ার মাধ্যমে একাকী শারীরিক কসরৎ সম্পন্ন হয় এবং এভাবেই আমরা প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকি। নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

নামাযের সময় মস্তিষ্কে কোটি কোটি সেল বা কোষ কাজ করে। কোষগুলোর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ দ্রুততর হয়। এ সব বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা সচল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে কোষের মতো গর্ত হয়। মস্তিষ্কের এরূপ একটি গর্ত আছে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছবি নিতে থাকে এবং বিভক্ত করতে থাকে। এই ছবি খুবই কালো এবং চমৎকার হয়।

মস্তিষ্কে এমন একটি গর্ত আছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়। এ সব গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ঐ সব কথাও হয়ে থাকে যেগুলোকে অনুভূতি দৃষ্টিও অনুমান করতে পারে এবং যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সংশোধন নাম দিয়ে থাকি। নামাযী যখন হাত উঠিয়ে উভয় কানের লতির নিকট নেয়, তখন এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুবই সূক্ষ্ম তাপ নিজ কনডেন্সর (Condensor) বানিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এই গর্তের সেল/ কোষগুলোকে চার্জ করে দেয়। যাকে অনুভূতি দেখতে ও আন্দাজ করতে পারে। এই কোষগুলো চার্জ হয়ে মস্তিষ্কে আলোর ঝলকানি দেয় এবং এ ঝলকানি দ্বারা সব স্নায়ু প্রভাবিত হয়ে এই গর্তের দিকে মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক সংশোধন নিহিত রয়েছে। একই সাথে মস্তিষ্ক থেকে হাতের মধ্যে এক তেজী প্রবাহ স্থানান্তর হয়।

কিয়াম বা দাঁড়ানো

কিয়াম বা দাঁড়ানোর সময় দেহ সম্পূর্ণরূপে অনড় ও শান্ত থাকে। এ অবস্থায়ও মানবদেহের ওপর নানা রকমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একজন নামাযী যখন কুরআন পাঠ করেন এবং নবী করীম (স)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন, আর যে ব্যক্তি তা শুনেন, কুরআনের আয়াতের আলোগুলো তার সারা দেহে প্রবাহিত হয়, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য বিস্ময়কর নিয়ামক বিশেষ।

কিয়াম করলে দেহে প্রশান্তি অনুভূত হয়। নামাযী যেহেতু কিয়ামের মধ্যে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে থাকেন, ফলে তার দেহ এক জ্যোতির্ময় বৃত্তের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লেপ্টে থাকে এবং তিনি যতক্ষণ এ অবস্থায় থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'নূর' থেকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্ট থাকেন। কিয়ামের মধ্যে নামাযী যে অবস্থায় থাকেন যদি আমরা প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকি তবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উন্নতমানের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। কিয়ামের দ্বারা মস্তিষ্ক (যার কাজ হলো আচরণ, প্রচলন এবং মানব দেহের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করা) শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

হাত বাঁধা

হাত বাঁধার সময় কনুইর আগে-পিছে থাকা পেশি এবং বগলের পিছনের নড়ার পেশি অংশ নেয় এবং সেগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়। নামাযে বাম হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়। মূলত মানব অঙ্গগুলোর ডান ও বাম দিকের কার্যকরণ পৃথক পৃথক থাকে। ডান অংশ থেকে বিশেষভাবে ডান হাত থেকে ঠিকরে বের হয় অদৃশ্য তরঙ্গ (Invisible rays) যা ধনাত্মক (Positive) হয়ে থাকে। বস্তুত ডানহাতের ধনাত্মক তরঙ্গ বাম হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে শক্তি ও সামর্থে পরিণত হয় এবং এরূপ নড়াচড়ার কারণে মানবদেহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং মানুষ পেরেশান বা অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকে।

নামাযে নারী ও পুরুষ এক স্থানে হাত বাঁধেন না, বরং পুরুষ নাভীর নিচে এবং নারী বুকের ওপরে হাত বাঁধেন। এর দ্বারাও মানব দেহের অনেক উপকার সাধিত হয়। পুরুষ যখন নাভী বা তার নিচে হাত বাঁধে তখন উভয় হাত থেকে তরঙ্গ বের হয় যা একই সাথে ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) হয়ে থাকে। তখন এই তরঙ্গমালার মিশ্রণে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় যা নাভীর মাধ্যমে স্নায়ু পর্যন্ত পৌছে যায় এবং এর মাধ্যমে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal Glands) তথা প্লীহা ও বৃক্ক সতেজ থাকে, ফলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও সচল হয়।

নিয়তের পর মেয়েরা যখন বুকের ওপর হাত বাঁধে তখন তার হৃদযন্ত্রে স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণতা প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে যার ওপর শিশুদের খাদ্য স্থিত হয়ে থাকে। নামায আদায়কারী মায়েদের দুধে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে মেয়েরা যখন বুকের ওপর হাত রেখে ধ্যান করে, এভাবে যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করে (যেমন

নামাযে হয়) তখন এ অবস্থানগত কারণে এক বিশেষ ভাষা প্রকাশের রশ্মি (Rays) সৃষ্টি হয়, যা ডাক্তারদের ভাষায় 'হালকা নীল' অথবা 'সাদা' রঙের হয়ে থাকে। এই রশ্মি তার দেহে প্রবেশ করে ও বের হতে থাকে এবং তার দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ দেহ কখনো ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় না।

রুকু করা

নামাযীর হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমর ঝুকানোর অবস্থাকে রুকু বলা হয়। এ নড়াচড়ায় দেহের সকল পেশির ব্যায়াম হয়ে যায়। রুকু দিলে নিতম্বের জোড়া ঝোঁকানো হয়, কনুইগুলো সোজা টান হয় এবং মাথাও সোজা হয়। এ সময় সব পেশি শক্ত অবস্থায় থাকে, পেট-কোমরের পেশি ঝোকে এবং সোজা হওয়ার সময় কাজ করে। এভাবে রুকুর মধ্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়।

চিকিৎসকগণ পায়ের গোড়ালি এবং কোমর ব্যথার রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুকুর মধ্যে মেরুরজ্জু শির দাঁড়া (Spinal Cord)-এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ঐ রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় তিনি এ রোগ থেকে খুব দ্রুত স্বস্তি বোধ করেন। রুকু দ্বারা কোমর ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার মেরু রজ্জু ফুলে গিয়েছে, তিনি খুব দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন।

রুকুর মাধ্যমে মূত্রাশয়ের পাথর সৃষ্টি প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের নলার অবসাদগ্রস্ত রোগী চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। রুকুর দ্বারা মস্তিষ্ক ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঞ্চালন (Circulation of Blood) -এর কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যকারিতা বেড়ে যায়।

সিজদা দেয়া

সিজদার মধ্যে নামাযীর নিতম্ব, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি ও কনুই ঝোঁকানো হয়ে থাকে। পায়ের নলা এবং রানের পিছনের পেশি এবং কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগুলো এর বাইরের দিক থেকে টান লাগে। এর সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও চেপে যায়। সিজদার মধ্যে নারীদের হাঁটুর সাথে বুক মিলানো হয়। এটা জরায়ুর জন্য উত্তম চিকিৎসা। সিজদার মধ্যে আরো অনেক শারীরিক উপকারিতা রয়েছে। মস্তিষ্কের জন্য রক্তের প্রয়োজন সর্বাধিক, যেহেতু মস্তিষ্ক অঙ্গের মূল। কিন্তু এর অবস্থান স্থল এরূপ যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌছানো কিছুটা মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে একত্রিত করার জন্য সিজদা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আমল।

Contents

মানব মস্তিষ্ক সাধারণ অবস্থায় বেশির ভাগ সময় হৃৎপিণ্ড থেকে উঁচু থাকে, এজন্য মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না। সিজদার মাধ্যমে মস্তিষ্ক হার্ট থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এজন্য এ সময় হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সহজে রক্ত সঞ্চালিত হয়। সিজদা যত দীর্ঘ হয় ততই বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এভাবে নবী করীম (স) দীর্ঘ সিজদার ফযিলত বর্ণনা করেন। এর ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বোধশক্তি, স্মৃতি শক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত অটুট থাকে। যেকোনো বয়সে মহান রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ মনে দীর্ঘ সময় সিজদার দ্বারা আত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের জন্য সুফল বয়ে আনে।

জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফের মতে 'সিজদায় উভয় হাত এবং সব অঙ্গের এক মোহের সাথে প্রসারিত করা এবং সংকুচিত করা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করে।' (আল মানাহিলু অকলিয়াহ লিল আহকামিন নাকলিয়াহ পৃ. ৪০৬) নামাযী ব্যক্তির চেহারায় সতেজতা থাকে। যেহেতু নামায এবং সিজদার কারণে শরীরের প্রতিটি শিরার মধ্যে সহজেই রক্ত সঞ্চালিত হয়।

বৈঠক বা কা'দা

নামায দুই অথবা চার রাকাআত আদায়ের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বিশেষ ভঙ্গিতে বসতে হয়। একে কা'দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় দেহ বৈঠক অবস্থায় থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ পড়ে। গোড়ালি বা টাখনু ও পায়ের অংশগুলো পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে। কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে। এজন্য এ সব অঙ্গে হালকা পাতলা ব্যায়াম হয়ে যায়।

নামাযেও রুকু এবং সিজদার পরে বৈঠকে বসা এ নিয়মগুলোর উত্তম প্রকাশ ঘটে।

সালাম ফিরানো

মুলতান মেডিকেল কলেজ অস্ত্রোপচারের ডাক্তার কাজী আব্দুল ওয়াহেদ-এর মতানুযায়ী নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা ডানে বায়ে ফিরানোর প্রয়োজন হয় এবং এক নামাযে এরূপ কয়েক বার (ফরয সুন্নাত মিলে) করার প্রয়োজন হয়। এরূপকারী হার্টের রোগ এবং এর মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকে এবং খুব কমই এ রোগে আক্রান্ত হয়। সালাম ফিরানোর সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি সক্রিয় থাকে। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নামাযের সময়সূচি

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান করেছেন। এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের চলাচল ব্যায়ামের ওপর টিকে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে সচল রাখে। জামাতে নামায আদায়ের জন্য থেমে থেমে মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এটা এক উচ্চমানের ব্যায়াম হিসেবে মানা হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চলাচলের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এভাবেই সে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে নামায আদায়ের জন্য নড়াচড়া করে থাকে। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল (স) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নামায জামাত সহকারে আদায় করা আবশ্যক করেছেন। এ সময়গুলো বিভিন্ন হওয়ার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা পাওয়া যায়। এক নামাযী পাঁচ সময়ে এ নামাজগুলো আদায় করেন এবং এ ছাড়াও তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল (স) -এর সুন্নাত। যার সময় ফযরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে। নামাযগুলো বিভিন্ন সময়ে হওয়ার বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে–

তাহাজ্জুদের সময়

নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। পাশাপাশি এটি থেকে নানাবিধ উপকারিতা অর্জন করা যায়। নিচে এগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১. তাহাজ্জুদের সময়ে সালাত আদায় করা অস্বস্তি ও নিদ্রাহীনতা দূর করে।

২. তাহাজ্জুদ সালাত হার্টের রোগের জন্য বড় ধরনের ওষুধ হিসেবে বিবেচিত।

৩. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা স্নায়ুর সংকোচন ও বন্ধনের জন্য উপকারী।

৪. মস্তিষ্কের রোগ। বিশেষ করে পাগল হওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যা দূর করার জন্য তাহাজ্জুদ শেষ চিকিৎসা।

৫. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা দৃষ্টি সমস্যার পরিপূর্ণ চিকিৎসা।

৬. তাহাজ্জুদের নামায মানবদেহের বৃদ্ধি, আনন্দ এবং অসাধারণ শক্তি সৃষ্টিসহ নামাযীকে উৎফুল্ল রাখে।

উপরিউক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করে।

রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পরে এটা বুঝতে হবে যে, মধ্যরাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগে আগে তাহাজ্জুদের সালাতের সময়। নামাযী যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে তখন তার মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তার অনুভূতি অদৃশ্য নড়াচড়া এবং দৃশ্য নড়াচড়া এবং অদৃশ্য রশ্মিগুলো সহজে গ্রহণ করে নেয়। 'আল্লাহর ওলীগণ যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন।' তাহাজ্জুদগোযার-এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এজন্য তাহাজ্জুদের সালাত আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল ও মারিফাত অর্জনের সর্বোচ্চ সিঁড়ি হিসেবে বিবেচিত।

ফযরের সময়

যখন রাত শেষ হয়ে আসে, তখন ফযর উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফযরের নামায ফরয করা হয়েছে। এসময় প্রকৃতি থাকে সতেজ হালকা এবং চাপমুক্ত। সারারাত আরাম করার পর যখন পাকস্থলীও খালি হয়ে যায়, কঠিন শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর বিবেচিত হয় এবং এরূপ করায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য এ সময় হালকা ও সংক্ষিপ্ত নামাজ নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়; বরং কোনো নামাযী যেন এই চার রাকআত নামায পড়ে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে। ফযর নামায পড়ে লোকেরা নিজ অবসাদগ্রস্ত দেহকে পুনরায় সক্রিয় ও চলমান করে। এরপর নিজ রিযিক ও জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজকর্মে মনোযোগ দেয় এবং মস্তিষ্ক পুনরায় চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সুবহে সাদিকের সতেজ প্রকৃতি এবং আলোতে মানুষ নামাযের জন্য বাইরে বের হয় এবং পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়। এতে সতেজ পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশ থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টি হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

ফযর নামাযের জন্য নামাযীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয়। সে ওযু করে নিজ দেহের অঙ্গগুলো পরিষ্কার করে, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি এগুলো না করে তাহলে মুখ এবং দেহের ওপর জীবাণু লাগতে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়। ফযরের নামায ফরয হওয়ার এক কারণ এই যে, পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মমাফিক হওয়া।

যোহরের সময়

মানুষ দিন শুরুর সাথে সাথে জীবিকা অর্জনে নিবেদিত হয়। ধুলা-ময়লা তার গায়ে লাগে। রাসায়নিক দ্রব্যও হাত-পায়ে লাগা বিচিত্র নয়। কেননা মানুষ জীবাণু যুক্ত

বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন তার দেহের ওপর জীবাণু আক্রমণ করে থাকে। এছাড়াও দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে শ্রান্তিও অনুভূত হয়। এ কারণে একজন নামাযী যোহর নামাযের জন্য ওযু করে ওযুর মাধ্যমে হাত, মুখ, পা ইত্যাদি ধৌত করনের ফলে রোগের আশঙ্কা কমে যায়।

ক্লান্তদেহ যোহরের নামায পড়ে আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়। এভাবেই ক্লান্তি দূর হয়। একজন নামাযী এভাবেই প্রশান্তি লাভ করে যোহরের নামাযের সময়। দুপুর পর্যন্ত কঠিন গরম পড়ার কারণে সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হতে শুরু করে। যদি এ ক্ষতিকর গ্যাস মানবদেহের ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়। তার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয় এবং সে পাগলামিরও শিকার হয়ে থাকে। তাই সে দুপুরের সময় যোহর নামায পড়ার জন্য ওযু করে নিজ দেহকে পুনরায় সতেজ ও প্রশান্ত করে। ওযুর দ্বারা একজন নামাযী বিষাক্ত গ্যাস থেকে নিজের দেহকে বাঁচিয়ে নেন এবং কয়েক প্রকারের জীবাণু থেকে দেহ মুক্ত করেন। এজন্য স্বয়ং স্রষ্টা পরিবর্তনশীল সময়ে অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় যোহরের সময় নির্ধারণ করেছেন।

আসরের সময়

চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞজন মাত্রই জানেন পৃথিবী দুই ধরনের গতিতে আবর্তণ করে। যেগুলো হলো : ১. লম্ব, ২. বৃত্তীয়। যখন সূর্য ঢলতে থাকে, তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে এমনকি আসরের সময় ঘূর্ণনের পরিমাণ একেবারেই হ্রাস পায়। এ কারণে মানুষের ওপর দিনের অনুভূতির চেয়ে রাতের অনুভূতি প্রবল থাকে। প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা দেখা দেয়। ফলে আসরের নামাযের সময় মানুষের সচেতন অনুভূতির ওপর অচেতন অনুভূতির প্রভাব শুরু হয়। ধীরে ধীরে মানুষ স্বীয় আরামের অনুভূতি লাভ করে। যে কোন নামাযী আসর নামাযের জন্য ওযু করে জাগতিক সমস্যার বেড়াজাল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদতে মশগুল হয়ে অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ততা দূর করে অচেতন অনুভূতির আক্রমণকে সহ্য করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

মাগরিবের সময়

কর্মচঞ্চল মানুষ সারাদিন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায় এবং নিজ ও পরিবারের জন্য রুজী রোজগার করে। যেই মহান সত্তা এগুলো অর্জন করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন সেই আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে। যার দ্বারা হৃদয় এক বিশেষ

Contents

আনন্দ অনুভব করে। মাগরিবের সময় সে আল্লাহ তাআলার সমীপে হাজিরা দিয়ে নিজ দাসত্বকে প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে এবং নুরানী তরঙ্গমালা তার অন্তরে পুলক জাগায়, যা তার আত্মাকে প্রশান্তি প্রদান করে। এই আলোকিত অদৃশ্য তরঙ্গমালার প্রভাব এদের বাচ্চাদের উপরও পড়ে, ফলে তারা শিষ্ট ও সৌভাগ্যবান হয়। যে মুসলমান নিয়মমাফিক মাগরিবের সালাত আদায় করে তার সন্তানগণ স্বীয় পিতামাতাকে মান্য করে। এ ধরনের নামাযীদের বাচ্চাগণ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে এবং তাদের ঘরের চতুর্দিকে বিরাজ করে সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ।

এশার সময়

স্বভাবগতভাবে মানুষ ভোজন লোভী। যখন সে কাজকর্ম থেকে ফিরে ঘরে আসে, খাবার গ্রহণ করে এবং স্বাদ ও লোভের কারণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। যদি সে খাওয়ার পর পরই শুয়ে পড়ে, তাহলে সে ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয়। মানুষ যদি সারা দিন ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত খাওয়ার পরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ে তাহলে সে অস্থিরতায় ভুগবে। শোয়ার আগে এবং অতিরিক্ত খানা খাওয়ার পরে কমবেশি ব্যায়াম করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম। দিনের ক্লান্তিকর ঘাম এবং ভোজনপটু মানুষের জন্য এশার নামায যে কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কম নয়। এশার নামায দ্বারা শরীর-মন শান্তি ও সহজ হয় এবং সাথে সাথে নামাযের শৃঙ্খলার মাধ্যমে খাদ্য হজম প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

এশার নামাযের মতো দীর্ঘ নামায আদায় করে শয়নকারী ব্যক্তি সারা রাতে প্রশান্তি ও আরামের সাথে ঘুমাবে এবং তার খাবারও হজম হয়ে যাবে। বর্তমানে চিকিৎসা অভিজ্ঞগণও শোয়ার পূর্বে হালকা-পাতলা ব্যায়ামের ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং বলেন, এই ব্যায়াম কয়েক প্রকারের ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা করে। হকপন্থীগণ এও বলেন যে শোয়ার পূর্বে নামাযের চাইতে সুন্দর ব্যায়াম আর হয় না।

নামায সম্পর্কে দার্শনিকদের অভিমত

নামায একদিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, অন্যদিকে দৈহিক ব্যায়ামের কাজও সম্পন্ন করে। এ ব্যাপারে চিন্তাশীল জ্ঞানী-গুণীরা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন–

রিভরান লীবান

প্রখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক রিভরান লীবান নামাযের উপকারিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

'আমি কয়েকবার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপাসনার সাথে মুসলমানদের নামাযের তুলনা করেছি। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামি নামায উত্তম। আমি উপলব্ধি করেছি, ইসলামি নামায কয়েকটি কাজের সমষ্টি। এর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও গুণগান ছাড়াও রয়েছে এক জান্নাতী আকাঙ্ক্ষা। ইসলামি নামাযে আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো, এর মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, রুকু, সিজদা এবং তাশাহুদ রয়েছে তার মধ্যে কাকুতি মিনতি এবং আশ্চর্য রকমের আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর কান্নাকাটিও রয়েছে।

আমি বেশিরভাগ জুমুআর দিন আলেকজান্দ্রার জামে মসজিদে শুধু ইসলামি নামাযের দৃশ্য দেখার জন্য যেতাম। আমি যখন খতীবের আবেগঘন বক্তৃতা, কাতারবদ্ধতা, রুকু, সিজদার গুরুত্বের ওপর চিন্তা করি তখন আমার অন্তরের ওপর আশ্চর্য রকমের প্রভাব পড়ে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইসলাম আমাকে আহ্বান করছে এবং তার ইবাদতের পূর্ণ পদ্ধতি প্রভাব বিস্তার করেছে আমার আত্মার ওপর।

রায়ন জেমস মর্ডিলার

খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু রায়ন জেমস মর্ডিলার এর মতে, গোঁড়ামি দ্বারা কাজ আদায় করা সহজ কিন্তু সত্য বলা দোষের এবং আমি বর্তমানে এই সমস্যাসঙ্কুল কাজকে (সত্য বলা) বাছাই করে নিচ্ছি। আমি একাধিকবার মুহাম্মদী বন্ধুদের (মুসলমানদের) সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তাদের বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় মশগুল ছিলাম। চৌদ্দ শতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই মুসলমান নিজ পয়গম্বর (আ)-কে মহব্বত ও আনুগত্য করছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কশীল সকল জিনিসেও ভালবাসা রাখে। খ্রিস্টান দুনিয়ার জন্য মুসলমানদের এই ভালোবাসা বোধ এবং একনিষ্ঠতার মধ্যে এক শিক্ষা রয়েছে। ইসলামি আবাদীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম নামায। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ করে।

কিন্তু একজন নামাযিও কখনও কখনও মন্দ কাজের দিকে ঝোঁকে এবং নজর দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি যে দিনে পাঁচবার নামায পড়ে অর্থাৎ এক মাসে একশ পঞ্চাশ বার আল্লাহ তাআলা থেকে তাকওয়া অর্জন এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করে, অবশেষে একদিন তিনি নিজের ওয়াদায় পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি বাস্তবিকই পরহেযগার মুত্তাকী হয়ে ওঠে।

Contents

সেন্ট হিটলার

রোমের বিশিষ্ট পাদরি সেন্ট হিটলার নিজের 'The Pray' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

আমি যে কয়টি ইসলামি রাষ্ট্র সফর করেছি, সেখানে তাদের উপাসনালয়গুলো দেখেছি। এ ইসলামি নামাযের ওপরও চিন্তা করেছি। আমার দৃষ্টিতে এটা এক উত্তম প্রকারের ইবাদত। যখন এক আল্লাহতে ইবাদতকারী নিজস্ব সব কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে তখন তার রূহ অস্তিত্ব লাভ করে। তখন অবশ্যই ঐ নামাযী স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

এমনকি তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর স্রষ্টার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। যার ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং অন্তর কলুষমুক্ত হয়। । বাড়তি এই ইবাদতের মধ্যে দৈহিক শক্তির আনুগত্যও রয়েছে। আমি দেখেছি যে, নামাযী ব্যক্তি দুর্বল নয়- বিশেষত ফযর নামাযের জন্য ভোরে ওঠা দেহ মনে এক আশ্চর্য রকম প্রভাব ফেলে।

প্রফেসর ডা. বার্থস জুযফ

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার বার্থস জুযফ 'নামায ও ইসলাম' শিরোনামে এক সাক্ষাৎকারে তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশ করেছেন। ডা. বার্থস স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

'আমি গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, বাস্তবিকই নামায পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যায়াম। এর মধ্যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত এই ব্যায়ামের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অদৃশ্য পদ্ধতিতে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান, গাম্ভীর্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি বুঝে নামাযের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।'

নামাযের মধ্যে হাত উঠানো, আবার বাঁধা, দৃষ্টিকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত রাখা, অতঃপর হাত ছেড়ে দেয়া এবং সামনে ঝুঁকে রুকু করা, এরপর সিজদাবনত হওয়া; এভাবে মাথা নত করায় হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালিত হয়। এছাড়াও নামাযের প্রতিটি বৈঠক অর্থাৎ থেমে থেমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বসা বাস্তবিকই এক পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যায়ামের কাজ করে।

মিস্টার এম. কিং

মিস্টার এম কিং-এর মতে, 'প্রকৃতিগতভাবে মানুষ যখন দুনিয়াবী কাজ এবং সামগ্রিক আনন্দে লিপ্ত থাকে তখন আত্মসংশোধনের বিষয় খেয়াল থাকে না এবং কিছু কিছু আনন্দের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো মানুষ নিজ স্রষ্টার স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় যখন আমরা (মিস্টার এম. কিং) এ কথার ওপর চিন্তা করি যে, ইসলাম মুসলিমদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছে এবং সর্বাবস্থায় স্বীয় ফরয আদায় করবে, তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নামায এক উত্তম প্রকারের হিদায়াত।

সত্য অনুসারী কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ (মুসলমান যখন সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে) একনিষ্ঠ প্রগাঢ় ভালোবাসার সাথে স্রষ্টা ও মালিককে স্মরণ করে, তার পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণগান করে; তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং এই ক্ষমতাশালী ও পবিত্র সত্তা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তাঁর আত্মা নিশ্চিতভাবে পবিত্র অবস্থায় পৌঁছে যায়, এবং তার দিল ও দেমাগ থেকে দূর হয়ে যায় ব্যক্তি পূজার মোহ।

উচ্চ স্তরের মুসলমানদের আমি দেখেছি যে, তারা নিজ প্রভাব ও মর্যাদার কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক তাদের সঙ্গে কথা বলার হিকমত রাখে না। অথচ যখন নামাযের সময় হয় তখন একজন অতি মর্যাদাবান ব্যক্তি অনাড়ম্বর পোশাকে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তার অপরিচিত ভাইদের সাথে মিলে ইমামের নেতৃত্বে ফরয নামায আদায় করেন। এ দৃশ্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এই ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠতা ও রিক্ততার শিক্ষা রয়েছে এবং এর মধ্যে সমতার মর্যাদা দৃশ্যমান।

সমতার বড় ঘটনা এই যে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আশ্চর্যজনকভাবে আমির-ফকির এবং ছোট-বড়কে এক সারিতে সমবেত করেছেন এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিঃস্ব ও অহংকারীকে যাদুকরীভাবে পাশাপাশি করে দেখিয়েছেন। আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, নামায একটি উত্তম ইবাদত।

স্যার উইলিয়াম ক্রাকস

স্যার উইলিয়াম ক্রাকস "Research in the pheromenon of Spiritualism" গ্রন্থে লিখেছেন, যদি কোন মানসিক রোগী মুসলমানদের নামায খুশু-খুযু (ভয় ও নম্রতা) এবং ধ্যানের সাথে পড়তে শুরু করে তাহলে সে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

ভয়েস এডমার্ল

পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ভয়েস এডমার্ল স্বীয় পুস্তক "Ten Voice Usborne"– এ লিখেছেন, "যদি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছাতে চাও তাহলে নামায পড়, নামায পড়, নামায পড়।"

Contents

দিওয়ান শিং মাফতুন

দেওয়ান শিং মাফতুন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী একজন ইন্ডিয়ান লিডার এবং সাংবাদিক। তিনি 'রিয়াসাত' (নেতৃত্ব) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা নির্দিষ্ট বৃত্তে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। দিওয়ান শিং মাফতুন একটি প্রবন্ধে লিখেন –

'নামায সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়। যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখাতে চায় সে যেন নামাযের ওপর চিন্তা করে। নামাযে তখন মালিক ও চাকরের পার্থক্য ঘুচে যায়, যখন একই কাতারে মাহমুদ ও আয়ায (বাদশাহ ও ফকির) এক সাথে এবং এক সারিতে দাঁড়ায়। যদি একজন মুসলিম নামায পড়তে শুরু করে তখন কুরআনে বর্ণিত আয়াত বিজয় লাভ করে। নামায ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের সর্বোত্তম উপায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাও খুশি এবং সৃষ্টিও সন্তুষ্ট থাকে।'

ইংরেজ লেখক

জনৈক মুসলিম নামায আদায় করছিলেন। তখন এক ইউরোপিয়ান (ইংরেজ) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এই নান্দনিক দৃশ্যটি অবলোকন করেন। যখন ব্যক্তিটি নামায সমাপ্ত করলেন তখন ইংরেজ জিজ্ঞেস করলেন–

'তুমি কোন কিতাব থেকে এই ব্যায়ামের পদ্ধতি শিখেছ? আমিও আমার পুস্তকে ব্যায়ামের এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছি এবং এই পদ্ধতিতে ব্যায়ামকারী দীর্ঘ জটিল ও কঠিন কষ্টকর রোগ থেকে সবসময় বেঁচে থাকবে। যদি দাঁড়ানো ব্যক্তি ব্যায়াম রত অবস্থায় সরাসরি সিজদায় চলে যায় তবে এর দ্বারা স্নায়ু ও হার্টের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, এজন্য আপনি যেমন (রুকু) করলেন আমিও আমার পুস্তকে এরূপ লিখেছি এবং আমি এও লিখেছি যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে। এর মধ্যে হাত বেঁধে রাখবে। তারপর (রুকুর ন্যায়) ঝুঁকে হাত এবং কোমরে ব্যায়াম করবে। এরপর মাথা জমিনে রেখে ব্যায়াম করবে। সব লোক এর সৌন্দর্য জানে না। আপনি এই ব্যায়াম কার কথার ওপর করেছেন? ঐ মুসলমান বলতে থাকলেন, আমি মুসলামন। আমার ধর্মীয় বিধানে এরূপ নির্দেশ রয়েছে, আমি আপনার পুস্তক দেখিও নি। আমরা মুসলমানগণ আজ থেকে চৌদ্দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে আমরা আমাদের নবী করীম (স) -এর প্রদর্শিত এই আমল নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করে থাকি। ইংরেজ ব্যক্তিটি এ কথা শুনে অভিভূত হলেন এবং এই মুসলমানের কাছ থেকে অধিক জ্ঞান হাসিল করলেন।

রোগ বিশেষজ্ঞ

হার্টের রোগে আক্রান্ত জনৈক পাকিস্তানি চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া গেলেন। ওখানে এক বিখ্যাত অভিজ্ঞ হার্টের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে কিছু ঔষুধ দিলেন। সাথে আট দিনের জন্য ফিজিও-থেরাপি ওয়ার্ডে বিশেষভাবে ডাক্তারের উপস্থিতিতে ব্যায়াম করার নির্দেশনা দিলেন। এ ব্যায়াম খুত-খুযুর সাথে নামাযের মতো ছিল। রোগী উপযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যায়াম করতে থাকলে ডাক্তার বললেন, আপনিই প্রথম রোগী যিনি এত শীঘ্রই সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করছেন। ব্যায়ামের পদ্ধতিই শিখতেই তো রোগীদের কমপক্ষে আট (৮) দিন সময় লেগে যায়। তখন মুসলমান রোগীটি বললেন,'আমি মুসলমান এবং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আমাদের নামাযের মতোই।' একথা শুনে ডাক্তার এই মুসলমান রোগীকে কিছু ওষুধ দিলেন এবং ঐ ব্যায়ামের নির্দেশনা দিয়ে ছুটি দিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সাইয়েদ মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন হামদানী

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আঘাত বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সাইয়েদ মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচডি) "ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার দেহের জন্য এটা এক ধরনের ব্যায়াম হিসেবে গণ্য হবে, যার মাধ্যমে যাবতীয় মানব অঙ্গসমূহের উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটবে এবং এর শক্তি বেড়ে যাবে। এটা ব্যতীত শ্বাসপদ্ধতি, রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি এবং হজম পদ্ধতির ওপরও উত্তম প্রভাব পড়ে এবং মানুষ জীবনব্যাপী রোগ ও শারীরিক সমস্যা থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (ইসলামে স্বাস্থ্যবিধি পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত।)

তিনি একই গ্রন্থের অন্য একস্থানে লিখেছেন– নামায এক উত্তম ইসলামি ব্যায়াম যা মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততাকে প্রশ্রয় দেয় না। সব ধর্ম মিলে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যার মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের আন্দোলন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযীর জন্যই অর্জিত হয়। এটা একান্তই ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়ামও বটে, যার প্রভাব মানুষের সব অঙ্গের ওপর পড়ে থাকে এবং দেহের সব অঙ্গের মধ্যে আন্দোলন ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য সুদৃঢ় থাকে। (পূর্বোক্ত-পৃ. ৩৬)

পশ্চিমা অধিবাসিরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি নামায কোনো ব্যায়াম না হয়েও বিভিন্ন ব্যায়ামের কাঠামো গ্রহণ করে ব্যক্তিকে সুসাস্থের অধিকারী

Contents

করে তোলে। যেমন জার্মানির প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েঙ'-এ খ্যাতনামা জার্মান ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ এ সত্যকে তার এ উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন–

'যদি ইউরোপে ইসলামি নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়ামের নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না।' (আল মাহাল্লিল আকলিয়্যাহ লিল আহকামিন নাকলিয়্যাহ পৃ. ৪০৬)

সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী লিখেন 'যখন নামায আদায়ের পদ্ধতিতে বারবার নামাযের রুকনগুলো পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন এক ধরনের ব্যায়াম হয়ে যায়, যার দ্বারা অঙ্গগুলো এবং জোড়াগুলোর উন্নতি, বৃদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যায়। এছাড়া নামাযের রুকনগুলো আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের ব্যায়াম অন্য কোনো মাধ্যম ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়। যার দ্বারা মানবদেহের সতেজ ও শক্তি স্থায়ী থাকে এবং দৈহিক ক্রিয়া-কর্ম প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।' (পূর্বোক্ত- পৃ. ৩৬)

ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী

ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন। যখন সেখানে তাকে সম্পূর্ণ নামাযের মতো ব্যায়াম সম্পর্কে পড়ানো হয় এবং বুঝানো হয় তখন এই ব্যায়াম দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হন। তার মতে, আজ পর্যন্ত আমরা নামাযকে এক ধর্মীয় ফরয বুঝতাম এবং পড়তে থাকতাম অথচ এখানে আশ্চর্য রকমের আবিষ্কার হয়ে থাকে যে, নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নির্মূল হয়ে যায়।

হাকীম মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চাগতাঈ

'নামাযের ব্যায়ামসমূহ যা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য সৌন্দর্যের মাধ্যম যা অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো যেমন– হার্ট, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং সব প্রকারের গ্লান্ডস (Glands) -এর উন্নতিও বৃদ্ধি করে এবং দেহকে রুটিনমাফিক ও সুন্দর বানায়।'

চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জা, মিসওয়াক, ওযু ও নামায এমন ইবাদত যেগুলোর মাধ্যমে দেহ ও আত্মা উভয়ের হিফাযত করা হয় এবং নিজ দেহকে বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখে।

রাসূল (স)-এর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা

নবীগণ আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রিসালাতের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। একে কুরআনী পরিভাষায় إصْطَفَى বলা হয়েছে।

নবীগণ নিষ্পাপ। তাদের থেকে চিন্তা ও ইজতিহাদের ভুল হয় না এবং প্রকৃত আখলাকের ত্রুটিও হয় না। প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে তাদের আবেগ, চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও প্রকৃতি সবই পবিত্র হয়।

মনস্তাত্ত্বিক রোগ

যে লোক কর্তৃক গুনাহ হচ্ছে না তিনি পাপের অনুভূতি (Guilt Complex)-র রোগসমূহ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকেন। এ ছাড়া যার রয়েছে ঈমান, তাকওয়া, ইবাদত, দুয়া এবং চরিত্র সম্পদ তিনি সর্বোচ্চ মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী হয়ে থাকেন। যেহেতু আম্বিয়া কিরামের মধ্যে উক্ত গুণগুলো সর্বোত্তম পর্যায়ে ছিল এজন্য তাঁরা সব রকমের মনস্তাত্ত্বিক রোগ থেকে থাকতেন মুক্ত।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা

আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিত্বকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তিনি কেবল তার যুগের সকল মানুষ থেকে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিলেন না, বরং দৈহিক দিক থেকেও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

নবীগণের রোগ-ব্যাধি

নবীগণের এমন রোগ হতো না, যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। কারণ তিনি যদি এরূপ রোগের শিকার হয়ে যান তাহলে প্রচারের কর্তব্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ঘাটতি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

এ ব্যাপারে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ (র) مرأة المنهج شرح مشكوة المصابيح গ্রন্থে লিখেছেন, নবীগণের দিকে এ ধরনের রোগের সম্পৃক্তকরণও গুনাহের কাজ।

হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগ

ইসরায়িলি বর্ণনায় হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগকে অশোভনভাবে 'কুষ্ঠ রোগ' এবং 'জীবাণু ঘটিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আইয়ুব (আ) কখনো শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হননি; বরং তাঁর দেহ মুবারকের ওপর ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি

ও ঘামচি বের হয়েছিল যে কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। তবে তিনি এতো কিছুর পরও সবসময় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জমী (র) নবীগণের গুনাহের প্রতিরোধ এবং হযরত আইয়ুব (আ)-এর পবিত্র দেহে কুষ্ঠ রোগের প্রতিবাদ করে লিখেছেন–

সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত আইয়ুব (আ) -এর কুষ্ঠ রোগ ছিল, মাআ'যাল্লাহ। আবার কিছু অগ্রহণযোগ্য পুস্তকেও একথা লিখিত রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে, এ সব কথা সম্পূর্ণ ভুল এবং কখনো তাঁর অথবা অন্য কোনো নবীর কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ হয় নি।

এ জন্য এ বিষয়ে সবাই একমত যে, যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণার কারণ হয়, সব নবী ঐ সব রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক। কেননা নবীগণের ওপর প্রচার ও হিদায়াত করার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই এ কথা প্রকাশ্য যে, যখন সাধারণ লোকেরা ঐ সব রোগ-ব্যাধি ঘৃণা করে তাঁদের থেকে দূরে চলে যাবে, তখন তাবলীগের কর্তব্য কীভাবে আদায় হবে? (আযায়িবুল কুরআন পৃ. ২২১, আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী, লখনৌ, ভারত।)

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর দুআ

প্রাকৃতিক নিয়মে নবীগণ রোগাক্রান্ত হতেন, তবে তাদের কখনো এ ধরনের রোগ হতো না যা সাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য। নবীগণ যদি রোগ-ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত থাকতেন তাহলে নবীগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) একথা বলতেন না– وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

অর্থ ঃ আর যখন আমি রোগগ্রস্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য প্রদান করেন।

(সূরা শূআরার ৭৬ নং আয়াত)

মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর রোগ

কুরআন মাজীদে হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগের উল্লেখ করা হলেও রোগের নাম বলা হয়নি। এ রোগ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই ছিল। আল্লাহর রাসূলগণ পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। ওফাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম (উর্দু) পৃ. ৪২৫)

ইমাম বুখারী (রহ), হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) -এর রোগ হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায় ৫৫৪, হাদীস-১৫৭৫)

রাসূলুল্লাহ (স) সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে পূর্ণরূপে সবল ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ জীন্দেগীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেছিলেন।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য

রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী বাণী খাকসার তাহরীক লিখেছেন। ঊনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) থেকে পর পর পাঁচ বা ছয়জন সন্তানের সুস্থতার সাথে জন্মগ্রহণ এবং পূর্ণ বয়স পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য থাকা এ কথার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ (স) সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বরং তার কোনো যৌন অথবা মরণঘাতি রোগ ছিল না। তাঁর একষট্টি বছর বয়সে হযরত মারিয়া (রা)-এর গর্ভ থেকে বাচ্চা হওয়া অন্তত তাঁর যৌনশক্তির সুস্থতার অধিক প্রমাণ।

তাঁর মস্তিষ্কের রোগ যদি থাকত তাহলে এ মহান ব্যক্তিত্ব, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা বীরত্ব এবং দৃঢ়তা দ্বারা তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করতে পারতেন না। এক বিশ্বজনীন ও চূড়ান্ত প্রকারের সমাধান যুক্ত আইন পেশ করতে পারতেন না। বরং স্বীয় (নবুওয়াত ঘোষণার পরের) ২৩ বছরের জীবনবাজি এবং কঠিন অতিবাহনের জীবনে কয়েক বার অসুস্থ এবং কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন । এর বিপরীত রাসূল (স)-এর পূর্ণ জীবনে তাঁর মৃত্যু রোগ ছাড়া অন্য কোন রোগের কথা জানা যায়নি। (রাসূলে সাদিক পৃ.-৩২ আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী, তারতীব ও সংক্ষেপ, গোলাম কাদীর খাজা।)

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা

আলিম-উলামার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) মৃত্যুর রোগ ব্যতীত কোনো সময়েই অসুস্থ হননি। যেসব স্থানে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ রাসূল (স)-এর পবিত্র দেহের এক অংশের সৌন্দর্য ও কমনীয়তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কোনো অসুস্থতার কথা স্থান পায়নি।

সুস্বাস্থ্য

কোনো মানুষ যখন নিজস্ব অঞ্চলের পরিবেশ ব্যতীত অন্য কোনো শহর অথবা অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো না কোনো প্রভাব ফেলে। আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ (স) শিশু এবং যৌবন বয়সে ব্যবসায়িক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। অতঃপর 'মক্কা থেকে হিযরত করে মদিনায়

প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও যুদ্ধের জন্য সফরকালে কোনো দিন অসুস্থ হননি। সাহাবায়ে আজমাঈন যখন মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিযরত করেন, তখন প্রায় সাহাবীই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ সময়েও আল্লাহ তাআলা সুস্থ রেখেছিলেন।

ভ্রমণ ও সুস্থতা

এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) সশরীরে বেশকিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ সময় শত শত মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মাস কিংবা সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। অথচ একবারের জন্যও তিনি কোনো প্রকার রোগে আক্রান্ত হননি। মদিনার মুসলমান মুহাজিরদের ওপর প্রথম বছর যে জ্বরের প্রকোপ আসে– শুধু রাসূল (স) ঐ জ্বর থেকে রক্ষা পান। (রাসূলে সাদিক, পৃ.-৩২, আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী; তারতীব সংক্ষেপ, গোলাম কাদীর খাজা)

বিষ মেশানো গোশত

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সারাজীবন রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাজত করেছিলেন। এমনকি খায়বরের বিজয় স্থলে যখন হারিছ–এর কন্যা যীনত (সালাম বিন মাশকাম ইহুদির স্ত্রী) বকরির ভুনা গোশত রাসূল (স)-এর খিদমতে পেশ করলো, এ গোশত ছিল বিষমিশ্রিত। নবী করীম (স) এ গোশত থেকে এক টুকরো উঠিয়ে মুখে দেন এবং চিবানোর পর তা থু থু করে ফেলে দেন। এক সাহাবী বশর বিন বারা (রা) এক লোকমা খেয়ে মারা যান অথচ আল্লাহ তাআলা হুজুর (স)-কে রক্ষা করেন। হুজুর (স) জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মহিলা স্বীকার করে যে, গোশত বিষাক্ত ছিল। সে আরো বলে, "আমি মনে করেছি যে, যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা বিষ দ্বারা আপনার নিকট থেকে মুক্তি পাব, আর আপনি যদি নবী হন তাহলে অবশ্যই আপনি এ বিষয়ের সংবাদ পেয়ে যাবেন।" (সহীহুল বুখারী- কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় নং ৫১০, হাদীস নং ২৮৮)।

রাসূল (স)- এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি মেধা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সকলের চেয়েও উন্নত ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরত্ব, প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা।

নবী-রাসূলগণ মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিক-নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা গোটা

পৃথিবীর সকল ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে হয়ে থাকে। এরূপভাবে আমাদের নবী করীম (স) -এর জ্ঞানও সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আসসালিহী তার রচিত 'সুবুলুল হুদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যদি জ্ঞানের একশত অংশ ধারণা করা যায় তাহলে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে প্রদান করেছেন এবং এক অংশকে সারা পৃথিবীবাসীকে দিয়েছেন। (সুবুলুল হুদা, খ-৭, পৃ. ১১ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী)

এ কথার আলোকে বিভিন্ন স্তরের মেধাবী লোকদের কার্যাবলি এবং সার্বিক হিসাব গ্রহণ করলে মানব ইতিহাসের জ্ঞান আহরণকারী কার্যাবলি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি উদঘাটন, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে অভিজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গির হিসাব গ্রহণ করে আজকের মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। যেহেতু এ সব মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ একশত ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম তাহলে রাসূল (স)-এর জ্ঞানকে কীভাবে আন্দাজ করা যাবে যার একার জ্ঞানের ভাগ হলো ৯৯(নিরানব্বই)?

খ্যাতনামা আলেম শাহ আল আযহারী (রহ) 'দ্বিয়াউন নবীতে' উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (স)-এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কারণ, নবীদের সরদার স্বীয় বিজ্ঞতার দ্বারা সকল প্রকারের লোকদের ইসলামের ছাঁচে এভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যে, তার মেজাজ ও ফিতরাত (প্রকৃতি) পরিবর্তন করে রেখে দেবেন। (দ্বিয়াউন নবী (স) খ-৫, পৃ. ২৭১ মুহাম্মদ করম শাহ, প্রকাশক দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনস, লাহোর।)

কাজীউল কুযাত (বিচারকদের বিচারক) কাজী ইয়াজ রহমাতুল্লাহ 'কিতাবুশ শিফা বি তারীফী হুকুমিল মুস্তফা'তে লিখেছেন–

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হুজুর (স) সকল মানুষের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেননি। অতীতের কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না, কোনো কিতাবও অধ্যয়ন করেননি। তারপর কীভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর প্রবাহিত করে ছাড়লেন। আহকামে শরিয়তকে কীভাবে আন্দাজে পেশ করলেন, কেনোইবা শোনার সাথে সাথে শ্রোতার মেজাজ তা না মেনে উপায় থাকল না। এসব বক্তব্যের ওপর দৃষ্টি দেয়ার পর একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, সর্বশেষ নবী জ্ঞান-বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে অগ্রগণ্য এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে, এ পন্থার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। (কিতাবুশ শিফা বিতারীফী হুকুকিল মুস্তফা, খ-১খ, পৃ. ১২৯, ১৩০, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী)

সীরাতে ইবনে হিসাবে নবী করীম (স)-এর জীবনের একটি ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর (স) ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও অতুলনীয় চৌকস জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

কাবা শরীফের নির্মাণ কাজে মক্কার কুরাইশগণ যখন প্রত্যেক গোত্র পৃথক পৃথক পাথর সংগ্রহ করতে শুরু করল এবং ইমারত তৈরি করতে মশগুল রইল, এবং এ বিল্ডিং রুকন পর্যন্ত পৌছাল, তখন প্রত্যেক গোত্র চাইলো যে তারা তা পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে, যা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত যাবে। প্রত্যেক গোত্র একে অপরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। বনু আব্দুদদার এক পেয়ালা রক্ত ভরে রাখলো এবং তাদের সব সঙ্গীদের হাত এ রক্তে চুবিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। রক্তের মধ্যে হাত ঢুকানোর অর্থ এই ছিল যে, আমরা জীবন দিব কিন্তু পিছু হটবো না। এ ধরনের উত্তেজনার মধ্যে চার-পাঁচ রাত অতিক্রম হলো এবং কোনোভাবে এ বিষয়ের কোনো সমাধান হলো না। অবশেষে কুরাইশ সম্প্রদায় মসজিদে হারামে সমবেত হয়ে পরামর্শ করতে থাকে কী করা যায়? কুরাইশদের সবচেয়ে বয়স্ক বুজর্গ আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখযুম বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা এক কাজ করো- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দরওয়াজা দিয়ে প্রথমে মসজিদে আসবে তার ফায়সালা মেনে নাও। ইবনে সায়াদ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত নেন; পরদিন যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নিব। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) সেখানে তাশরীফ রাখেন। সব লোক তাঁকে দেখে খুবই খুশি হন এবং বলতে থাকেন, অবশ্যই ইনি আল-আমিন। তিনি যে ফয়সালা করবেন আমরা খুশি মনে তা মেনে নেবো। যখন হুজুর (স) পৌছালেন তখন সবাই বললেন, আমরা আপনার ফায়সালা মেনে নিচ্ছি, আপনি ফায়সালা করে দিন। হুজুর (স) বর্ণনা করেন : আমার নিকট এক খণ্ড কাপড় নিয়ে আসো। লোকেরা কাপড় নিয়ে আসলে রাসূল (স) নিজে কাপড়ের ওপর হাজরে আসওয়াদ রেখে ঘোষণা করেন, তোমরা সব লোক সব গোত্র থেকে এই কাপড় ধর এবং একে উঠিয়ে দেওয়ালের পাশে নাও। যখন সব গোত্রের লোকেরা এই কাপড় (যার মধ্যে হাজরে আসওয়াদ ছিল) নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ওটাকে উঠিয়ে দেওয়ালে রেখে দেন। এভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর ওপর ভবন হতে থাকে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ-১, পৃ.-১২৭, তবাকাতে ইবন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২২৫, তারীখে তাবারী, খ-১, পৃ.-৬৮)

এভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই প্রজ্ঞা ও বীরত্ব যুদ্ধের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গোত্রগুলোকে রক্তপাত থেকে হিফাজত করল। এ ঘটনা থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, রাসূল (স)-কে সালিশ বানানোর সময় সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির ওপরে সকলের পূর্ণ নির্ভরতা ছিল। তাঁরা জানতেন যে, তিনি সবচেয়ে মেধাশক্তিসম্পন্ন। তিনি এমন কোনো পন্থা অবশ্যই বের করবেন যার ওপর প্রতিটি গোত্র ঐকমত্য পোষণ করবে।

নবী করীম (স)-এর জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পর্কে আল্লামা যাইনী দিহলান আসসীরাতুন নব্বীয়াহ'তে লিখেছেন- 'আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব নবী (স)-কে সব সৃষ্টির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়ের ওপর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যাতে মহানবী (স) অবস্থার সংশোধন করতে পারেন এবং উত্তম অবস্থাগুলোর দিকে লোকদেরকে দিকনির্দেশনা দানে সক্ষম হন। আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স)-কে তার সকল বান্দার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, তিনি যাতে সকলকে আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিতে পারেন। আর এ কাজ যত সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়াবলির সংশোধন না করেন এবং এ কথার পরিধি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানার ওপর নির্ভর করে । এ জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী (স)-কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তৈরি করেছিলেন। হুজুর (স) সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সামষ্টিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন, যার মাধ্যমে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থার দাবি পূর্ণ হত। (সীরাতে নব্বীইয়াহ, খ-৩, পৃ. ২৩, আহমদ ইবনে যাইনী দিহলান। দ্বিয়াউন নবী করীম (স) খ-৫, পৃ. -২৭২)

কাজীউল কুযাত আল্লামা কাজী ইয়াজ (র) রাসূল (স) -এর জ্ঞানগত মর্যাদা নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا .

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই নবী করীম (স)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সব লোকের চাইতে উত্তম ছিল। সব বিষয়ে হুজুর (স)-এর মত সকল লোকের থেকে উত্তম ছিল। (কিতাবুশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-৮২ কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।)

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) থেকে বর্ণিত, মানব সভ্যতার শুরু থেকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, ঐ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নবী করীম (স)-এর মুকাবিলায় এতটুকু কণাও নয় দুনিয়ার সব মরুভূমির কণার তুলনায় যা হয়। (দ্বিয়াউন নবী (স) খ-৫, পৃ. ২৭৩, পীর মুহাম্মদ করম শাহ, দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর)

ফরাসী প্রাচ্যবিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূল (স) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন : রাসূলুল্লাহ (স) তিনি তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর (যিনি কোনো শিক্ষকের নিকট পড়েননি) ছিলেন, অথচ জ্ঞান ও মতামতের দিক থেকে সকলের থেকে ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। (আরবের ইতিহাস পৃ. -১০৩, মসিয়ে সিদিভ, অনুবাদক মৌলভী আব্দুল হালীম আনসারী)।

ইংরেজ ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) মহানবী (স) সম্পর্কে (Hero and Hero Worship) গ্রন্থে লিখেছেন –

'একথা ঠিক যে, নবী (স) অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূল (স)-এর পর্যবেক্ষণ ছিল গভীর এবং স্মৃতিশক্তি ছিল প্রচণ্ড রকমের।' (অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবী, পৃ.-৪১, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া খান, জাহানজীব বুলাক, আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর)

ইউরোপের প্রথিতযশা বিশ্লেষক কে. টি. লাওল-এর বক্তব্য হলো– মুহাম্মদ (স) একজন বড় রাষ্ট্রপতি, একজন বড় বিজয়ী, অনেক বড় জ্ঞানী ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

নবী (স)-এর প্রতি অপবাদ

মক্কার কাফিরগণ যখন প্রতিরোধের কোনো সাধারণ ভাষা হারিয়ে ফেলে তখন তারা নবী (স) কে পাগল বলতে থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাকীমে বর্ণনা করেছেন ঃ مَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ.

অর্থ ঃ হে প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার রবের করুণায় পাগল নন।

(সূরা ক্বালাম, আয়াত-২)

কুরআন মাজীদের এ ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা সার্বক্ষণিক অস্বীকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পাগল নন; পাগল ছিলেন না এবং কখনো পাগল হবেন না।

হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের গুরুত্ব দেয় (এর সম্মান রক্ষা করে) সে পাগলামি এবং মাথা খারাপ হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে এবং কোনো কোনো বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এর জ্ঞান কখনো লোপ পাবে না (অর্থাৎ সে বোধহীন হবে না)। মাওয়াহিবুর রহমান, প্যারা-২৯,পৃ.-২৮, সাইয়েদ আমির আলী মালহাবাদী)

কুরআন মাজীদকে শুধু গুরুত্ব দেয়ার কারণেই যদি এতোটা মর্যাদা লাভ করা যায়, তাহলে তাঁর মর্যাদা কী হবে যার ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ?

রাসূল (স)-এর দৈহিক শক্তি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বীয় মর্যাদাবান বান্দা নবী করীম (স)-কে অপরিমেয় দৈহিক শক্তি দান করেছিলেন। এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) 'মাদারিজুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে লিখেন : হুজুর আকরাম (স)-এর শক্তি, বাহুর শক্তি এবং মজবুতি এতই ছিল যে, বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর (পাহলোয়ান) তাঁর সামনে দাঁড়াতেও পারত না।

রুকানা ছিলেন আরবের একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর, চারদিকে তার দৈহিক শক্তির সুখ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি এক শত লোকের মুকাবিলা করে পরাজিত করে দিতেন। এ ব্যাপারে সুনানে তিরমিযিতে রয়েছে–

'একদিন নবী (স) আরবের কোনো পাহাড়ি এলাকায় (মক্কার কোনো ঘাঁটি) চলতে চলতে রুকানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বিশ্বনেতা (স)-এর এ অভ্যাস ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন হুজুর (স) তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন।'

হুজুর (স) রুকানাকেও দাওয়াত দিলেন। বললেন, তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবা করে নাও এবং অংশীহীন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনো।

রুকানা বলল, আমি এক শর্তের ওপর এ দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত আছি, তা হলো আপনি যদি আমাকে পরাজিত করতে পারেন, তবেই আমি ঈমান আনবো।

নবী করীম (স)-এ শর্তে রাজি হলেন। রুকানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, রুকানা! যদি তুমি এ শর্তের ওপর ঈমান আনার ওয়াদা কর তাহলে আমি এ শর্ত পূরণ করতে তৈরি আছি।

সাথে সাথে রুকানা নেংটি পড়ে ময়দানে এসে দাঁড়াল। রাসূল (স)ও তাশরীফ নিলেন। রাসূল (স) বাজু (বাহু) ধরলেন এবং এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে ফেলে দিলেন। সে হয়রান এবং পেরেশান হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অসাবধানতার মধ্যে আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনি আমাকে আরেকবার পরাজিত করতে পারলে আমি ঈমান আনবো। রাসূল (স) তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রাসূল (স) প্রস্তুতি নিলেন, তার বাহু ধরে ফেললেন এবং জমিনের ওপর ফেলে দিলেন। রুকানার এ ব্যাপারে সামান্যতম ধারণা ছিল না যে তাকে এতো সহজেই ফেলে দেয়া যাবে। তাই লজ্জিত অবস্থায় আবার উঠলেন এবং তৃতীয়বারের মতো আবার কুস্তির দাওয়াত

দিলেন। এরপরও রাসূল (স) তাকে এ কথা বলেননি যে, দু'বার আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি। বরং আল্লাহর রাসূল পুনরায় কুস্তি লড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। অতঃপর রাসূল (স) তাকে এমনভাবে ঝটকা দিলেন যে, চোখের পলকে জমিনে ফেলে দিলেন। তিনি এবার আর অস্বীকার করতে পারলেন না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কালিমা শাহাদাত পড়েন এবং ঘোষণা করেন যে, এটা কোনো দৈহিক শক্তি নয়, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে রূহানি শক্তি দ্বারা তিনবার পরাজিত করেছেন। আমি একথা স্বীকার করে নিলাম যে, আপনি আল্লাহ তাআলার রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে রুকানা ছাড়াও আরো অনেক লোক কুস্তি করেছেন এবং তিনি সকলের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। এদের মধ্যে আবুল আসাদ ছিলেন একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর। যে গরুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে যেত এবং লোকজন তার নিচ থেকে চামড়া টেনে বের করার পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। চামড়া ফেটে যেত কিন্তু নিচ থেকে বের হতো না। কুস্তিগীর আসাদ একদিন নবী করীম (স)-এর সঙ্গে কুস্তি লড়তে চাইলেন। তিনি বললেন, যদি আপনি আমাকে জমিনের ওপর ফেলতে পারেন তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনবো। নবী কারীম (স) তাকে জমিনের ওপর চিৎ করে ফেলে দেন কিন্তু সে ঈমান আনেনি।

নবী করীম (স)-এর দেহ মুবারক ছিল পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রকমের পবিত্র। হযরত উম্মে মা'বাদ (রা) রাসূল (স)-এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে বলেন ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেট বড় হওয়া এবং পেট সামনের দিকে বেড়ে যাওয়ার দোষমুক্ত ছিলেন। (আল অফা বিআহওয়ালি মুস্তফা, পৃ.-৪৫২, ইমাম আব্দুর রহমান ইবন জাওরী।) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহ মুবারক ভারসাম্যপূর্ণ ছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত 'আমি দ্রুত চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসূল (স) থেকে দ্রুত আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি দ্রুত হাঁটতেন তখন মনে হতো জমিন নিজে নিজে জড়িয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি চলতেন তখন পূর্ণ শক্তি দ্বারা চলতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চলন বড়ই মাপা হতো। এতদসত্ত্বেও কেউ রাসূল (স)-এর গতি অতিক্রম করতে পারেনি। (কিতাবুশ শিফা, পৃ.-৮২, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।) (দ্বিয়াউন নবী খ-৫, পৃ. -২৭৪, পীর করম শাহ, আজহারী, দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স লাহোর।)

বর্ণিত বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নবীগণ (আ) ছিলেন রোগ-বালাই থেকে নিরাপদ। সকল প্রকারের ঘৃণার উদ্রেককারী রোগ-বালাই থেকে মুক্ত। বিশেষত আমাদের নবী করীম (স) মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক শক্তি, মেধা, পাণ্ডিত্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে ছিলেন সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম।